সম্পূর্ণ উপন্যাস

কলাবতী, অপুর মা ও পঙ্কু

মতি নন্দী

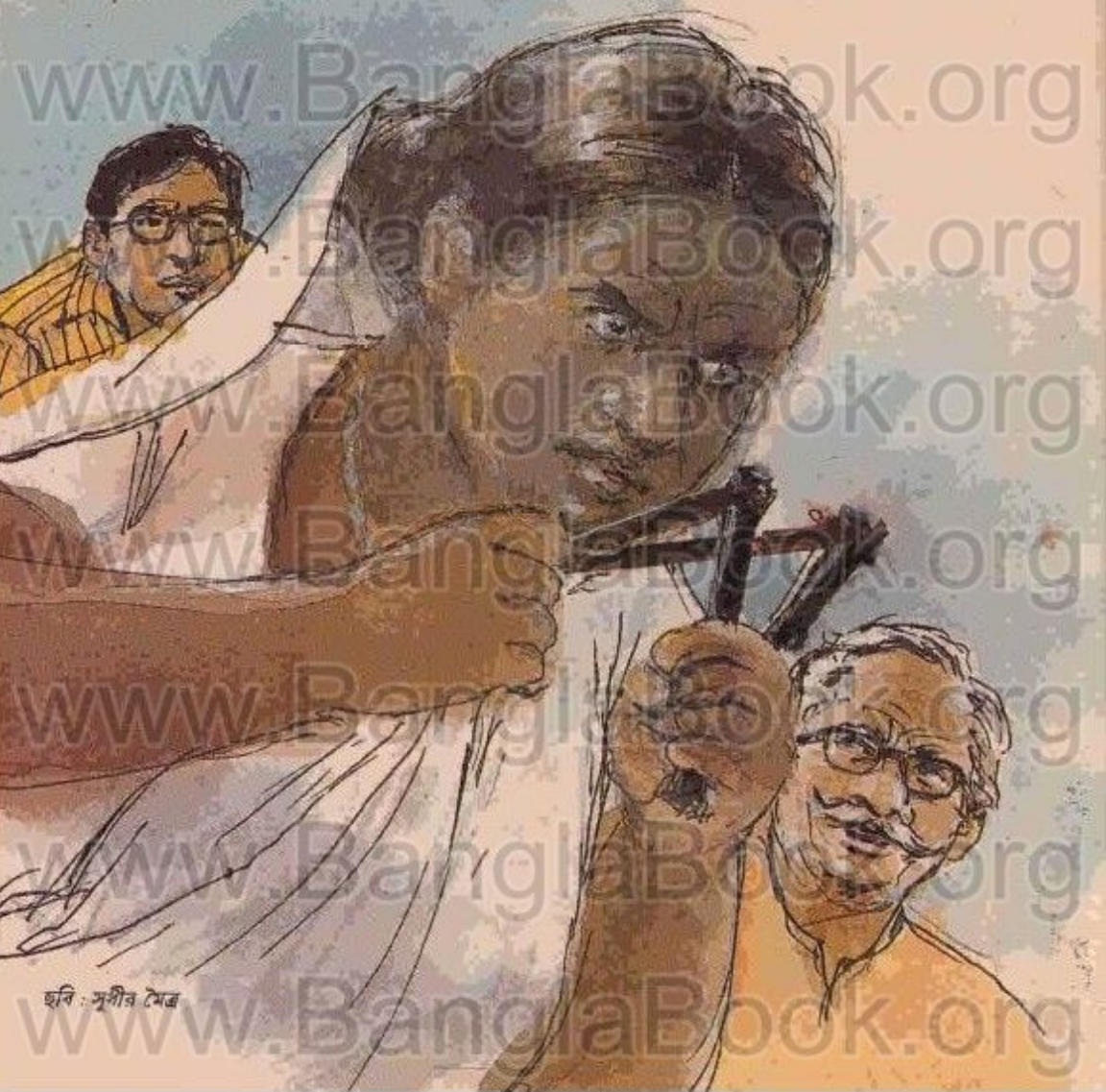

ছবি : সুমীর মৈত্র

www.BanglaBook.org

সিংহবাড়িতে গুলতির প্রবেশে বড়ির ভূমিকা

স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী স্কুলের ব্যাগটা—যেটাকে দাদু রাজশেখর মাঝে-মাঝে বলেন 'গন্ধমাদন' এবং কলাবতীকে 'হনুমান'— টেবলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে ধপ করে বসে মুখ তুলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, "উফ্‌ফ কী গরম রে বাবা!...পাখাটা একটু বাড়িয়ে দেবে পিসি?"

অপুর মা রেগুলেটর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একটু জিরিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, ততক্ষণে

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কলাবতী, অপুর মা ও পথু

মতি নন্দী

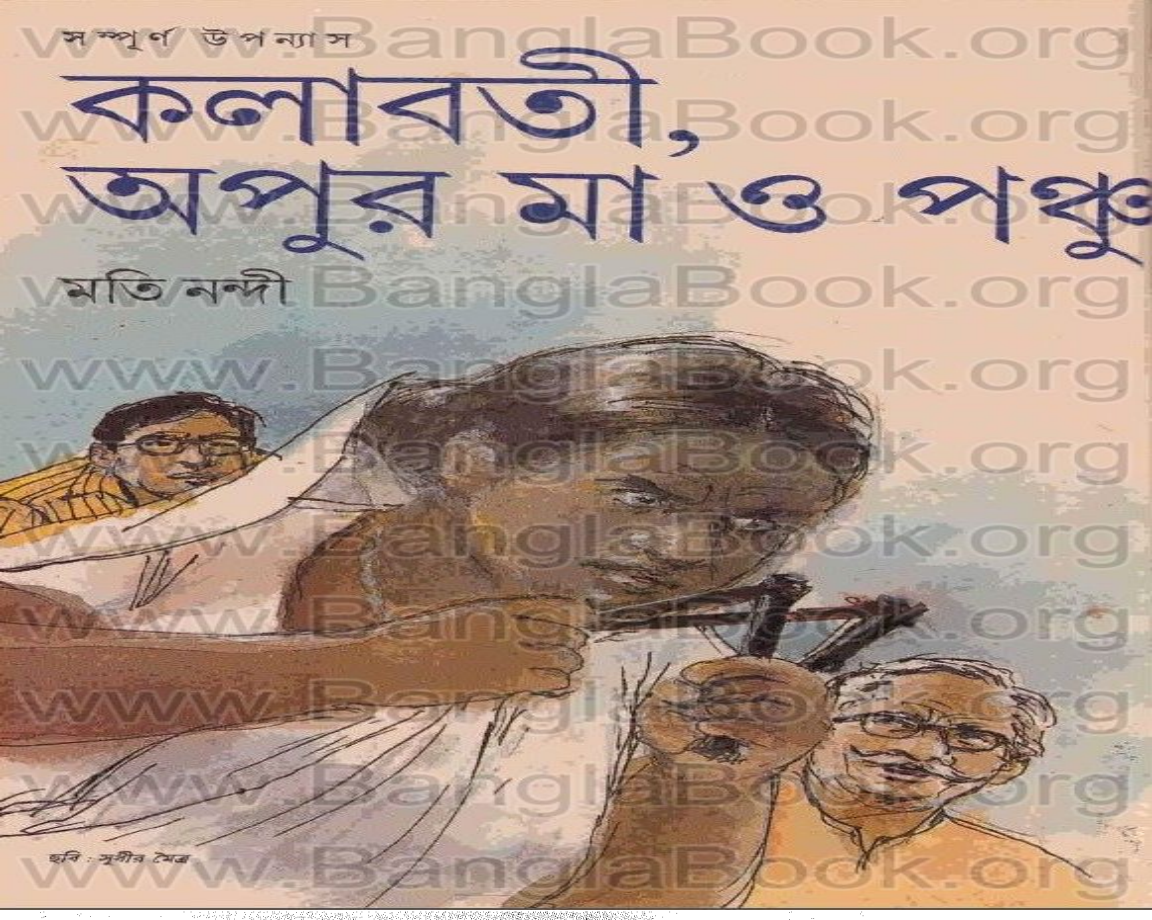

ছবি : সুধীর মৈত্র

পেঁপেটা কেটে আনি।"

"পেঁপে!" কলাবতী সিধে হয়ে বসল। এই ফলটি তার খেতে একদমই ভাল লাগে না।

"আটঘরা থেকে দিয়ে গেছে। পেঁপে, সজনে ডাঁটা, চালতা, কচু, মস্তোমান কলা, পটল, আরও কত কী।"

"অ্যাত জিনিস খাবে কে?"

অপুর মা ঠোঁট মুচড়ে বলল, "খাওয়ার লোকের অভাব? একা মুরারিদাই তোমার কাকার সঙ্গে তিনদিনে শেষ করে দেবে।"

"আমার খিদে নেই।" গম্ভীর মুখে কলাবতী বলল।

"খিদে নেই? রোজ এই এক কথা। কী খেয়েছ টিপিনে? হজমি, চাটনি আচার, আলুকাবলি, ঝালমুড়ি?"

"একটাও না। ধুপুকে আজ ওর মা সঙ্গে দিয়েছিল খিচুড়ি। কাদা কাদা নয়, শক্ত শক্ত বেশ ঝরঝরে অনেকটা পোলাওয়ের মতো, বলল ভুনি খিচুড়ি। হটপট থেকে চামচে তুলে তুলে খাচ্ছে—"

"আর তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলে।" অপুর মা'র চোখে দপদপ করল ধিক্কার। সেটা অগ্রাহ্য করে কলাবতী বলল, "দেখছিলুমই তো। দেখব না? কী জিনিস।"

"কেন তুমি কি কখনও খাওনি? এই তো ক'দিন আগে ভাদ্দর মাসে ছোটবাবু বললেন বিস্টি হচ্ছে আজ খিচুড়ি খাব। করে দিলুম, বেগুনিও করলুম।"

"সে তো গত বছর অগাস্ট মাসে। সেটা ছিল বেঙ্গলি খিচুড়ি কিন্তু এই ভুনি খিচুড়ি? ধুপু যখন এক চামচ মুখে ঢোকাচ্ছে আর একটা করে বড়িভাজা মুখে নিয়ে মড়মড় করে চিবোচ্ছে, কী বলব পিসি ওর চোয়াল দুটো কী বিউটিফুলি নড়াচড়া করছিল আর মড়মড় সাউন্ডটা!" কলাবতী বড়ি চিবনোর শব্দ চোখ বন্ধ করে শুনে বলল, "আমি আর থাকতে পারলুম না।"

"তুমি অমনি চেয়ে বসলে।"

"চাইবই তো। আমার প্রাণ যে চাইছিল। কাকা তো আমাকে বলেই দিয়েছে, কালু আত্মাকে কখনও কষ্ট দিবি না, দিলে ভগবানও তোকে কষ্ট দেবেন। ফুচকা, চিকেন রোল খেতে তোর আত্মা যখনই চাইবে তখুনি খাবি। চকোলেট, আইসক্রিমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এসব খাওয়ার অপকারিতা নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে চাস তা হলে বুড়ো বয়সে ঘামাবি, এখন যা পারিস সাঁটিয়ে যা। পিসি আমি কিন্তু ধুপুর কাছে চাইনি। ও আমার মুখ দেখে নিজেই বলল, কালু একটু খেয়ে দেখবি? তখন যেসব কথা ভদ্রতা করে বলতে হয়, বললুম। ধুপু আমার থেকেও এককাঠি, দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে বলল, ঠিক আছে, খেতে হবে না। পড়লুম বিপদে। তাড়াতাড়ি বললুম, মাসিমার হাতের তৈরি বড়ির কি অমর্যাদা করা যায়? বলব কী পিসি, সে কী বড়িভাজা! মোহন্তর পকৌড়িও সেই বড়ির ধারেকাছে আসে না।" কথাগুলো বলার সঙ্গে কলাবতী জিভ দিয়ে টাকরায় চকাত চকাত শব্দ তৈরি করল।

শুনতে শুনতে কালো হয়ে এল অপুর মা'র মুখ। গম্ভীর থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, "পেঁপেটা নিশ্চয় মুখে রুচবে, ওটা আমার রান্না করা নয়।"

কলাবতী বুঝে গেল পিসি দারুণ চটেছে, কারও রান্নার প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। ও চায় সবাই ওর রান্নারই গুণগান করুক। আর সত্যি-সত্যিই অপুর মা'র রান্নার হাতটা ভাল, বিশেষ করে নিরামিষ রান্নার। সেজন্য রাজশেখরের চাপা একটা গর্বও আছে। হাজার হোক অপুর মা তারই গ্রামের মেয়ে।

আটঘরায় সিংহদের জমিদারি সেরেস্তায় অপুর মা'র ঠাকুর্দা কানাই মোদক লেঠেলদের সর্দার। বকদিঘির মুখুজ্জেদের সঙ্গে জমি দখল নিয়ে একবার লাঠালাঠি করতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে খোঁড়া হয়ে যায়। তখন তাকে করা হয় রাজশেখরের বাবার খাস ভৃত্য।

অপুর মা'র বাবা সাতকড়ি তখন এগারো বছরের। সমবয়সী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাতকড়ির কাছেই রাজশেখর গুপিসায়রে সাঁতার শেখেন। তার সাইকেল চালানোর শিক্ষাতেও সাতকড়ির হাত ছিল। একদিন কামরাঙা পাড়তে গাছে ওঠেন। ডালে জড়িয়ে ছিল একটা গোখরো সাপ। ফণা তুলে স্থির হয়ে তিন হাত দুর থেকে রাজশেখরকে লক্ষ করতে থাকে। সেই সময় ধাক্কা দিয়ে সাতকড়ি ফেলে না দিলে কী যে হত, তাই ভেবে এখনও তিনি শিউরে ওঠেন। গাছে চড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, তাই ব্যাপারটা দু'জনেই চেপে যায়। সাতকড়ি যুবক হয়ে উঠতেই কানাই তাকে তারকেশ্বরে ডাল-মাছ-ভাতের একটা ছোট্ট পাইস হোটেল করে দেয়। অপূর্ব রান্নার হাত ছিল সাতকড়ির। একবার যে ধোঁকার ডালনা কি চালতা দিয়ে টকের ডাল খেয়েছে তাকে আবার করুণাময়ী হোটেলে খেতে আসতে হবেই। এই করুণাময়ীই অপুর মা।

সাতকড়ি নিজের হাতে মেয়েকে রান্না শেখায়, বিয়ে দেয় তিন ক্রোশ দূরের এক পাঠশালার শিক্ষকের সঙ্গে, কিছু জমিজমা যৌতুক দিয়ে। তারকেশ্বরের হোটেলটি মৃত্যুর আগে সাতকড়ি দিয়ে যায় তিন ছেলেকে। দু'বছরের মধ্যেই রান্নার সুনাম হারিয়ে হোটেলের লোকসান শুরু হয়, তৃতীয় বছরেই ছেলেরা হোটেল বিক্রি করে নিজেদের মধ্যে টাকা ভাগ করে নিয়ে তারকেশ্বর বাজারে মাছ আর আলু বেচতে বসে যায়, তৃতীয়জন চায়ের দোকান দেয় বাজারেই।

ইতিমধ্যে করুণাময়ী বিধবা হয়ে আটঘরায় ফিরে এসেছে। তিন ভাইয়ের ভিন্ন সংসার। বোনকে তারা একটা ঘর ছেড়ে দিল থাকার জন্য, কিন্তু খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিল না। যেটুকু নিজস্ব জমিজমা করুণাময়ীর ছিল তাই দিয়ে সারা বছরের খরচ চালিয়ে অপুকে স্কুলে পড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না, এখন সে খুঁজতে শুরু করে ভদ্রগোছের কোনও কাজ।

রাজশেখর বছরে একবার আটঘরায় আসেন জমি পুকুর বাগানের বিলিবন্দোবস্তের জন্য। আগের মতো বিশাল জমিদারি আর নেই, তাই নেই নায়েব, পাইক, গোমস্তাদের বাহিনী। এখন শচীন হালদার নামে একজন কর্মচারী সম্পত্তির তদারক আর দু'জন ভৃত্য আর মালি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করে। বছরে একবার দু'বার আনাজ সবজি মাছ ফল ইত্যাদি তারা কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসে।

চারদিনের জন্য রাজশেখর আটঘরায় আসবেন খবর পাঠিয়েছেন। সিংহিবাড়িতে ধুম পড়ে গেল ঝাড়পোঁছের, বাগানের ঝোপজঙ্গল সাফ হল। কিন্তু রাজশেখরকে রান্না করে খাওয়াবে কে? গত বছর অস্থায়ী রাঁধুনির কাজ করেছিল মিষ্টির দোকানের যতীন। এখন সে মিষ্টি বানানোর চাকরি নিয়ে শ্রীরামপুর চলে গেছে। শচীন হালদার দু'দিন হন্যে হয়ে খুঁজে না পেয়ে খোঁজার দায়িত্বটা দিলেন স্ত্রীকে। তিনি আধঘণ্টার মধ্যে হাজির করলেন করুণাময়ীকে।

আটঘরা পৌঁছনোর পর দুপুরে দোতলার দালানে ভাত খেতে এসে রাজশেখর চোখ কপালে তুললেন। মুহূর্তে মনে পড়ে যায় তাঁর ছেলেবেলার কথা। এই বগি থালায় ঠিক এই জায়গায় মায়ের হাতে তৈরি পশমের রঙিন ফুল-তোলা আসনে বসে তার বাবা ভাত খেতেন। থালার মাঝখানে স্তূপ করে থাকত জুঁইফুলের মতো ভাত, ভাতের পাশে দু-তিনরকমের ভাজা, থালা ঘিরে চার-পাঁচটা বাটি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন শচীন। রাজশেখর জিজ্ঞেস করলেন, "এই আসনটা পেলে কোথায় আর থালাবাটিগুলো?"

শচীনও জানতেন না আসন আর থালাবাটিগুলো এল কোথা থেকে। মাথা চুলকে আন্দাজেই বললেন, "ভাঁড়ারের কাঠের সিন্দুকে তোলা ছিল, বার করে মাজালুম।" কথাটা বলে আড়চোখে তিনি পাশে তাকালেন। দরজার আড়ালে সাদা থান কাপড় পরা বিশাল এক ঘোমটায় মুখ ঢাকা দশাসই এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে সেই মূর্তি তখন বলল, "ভাঁড়ার ঘরে নয়, রান্নাঘরের ওপরের তাকে ছিল থালাটা আর আসনটা ছিল শোয়ার খাটে গদির নীচে।"

ফিসফিসিয়ে বললেও অপুর মা'র স্বর দশ-বারো হাত বৃত্তের

মধ্যে পরিষ্কার শোনা যায়। সুতরাং রাজশেখর শুনতে পেলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের মাঝপথে রাজশেখর শচীনকে বললেন, "থোড় ছেঁচকিটা আর একটু দিতে বলো তো।"

আড়াল থেকে বাটি হাতে বেরিয়ে এল অপুর মা। সিংহিবাড়িতে খাওয়ার সময় দ্বিতীয় পরিবেশন হাতায় করে পাতে দেওয়া হয় না। বাটিটা মেঝেয় রেখে মুখের সামনে কাপড় টেনে অপুর মা বলল, "আর একটু কচুবাটা আর পোস্তর বড়া কি আনব?"

রাজশেখরের মুখে হাসি খেলে গেল। বুঝলেন খাওয়ার সময় তাঁর মুখের ভাব এই রাঁধুনিটি বেশ ভালভাবেই লক্ষ করেছে। বললেন, "নিয়ে এসো।"

খাওয়া শেষ করে রাজশেখর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ইজিচেয়ারে। রুপোর রেকাবিতে (এটাও রাজশেখর প্রায় চল্লিশ বছর পর দেখলেন) ছোট্ট ছোট্ট খিলির চারটি পান নিয়ে অপুর মা এল। খিলিগুলো আঁটা লবঙ্গ দিয়ে।

"বাড়ি কোথায় তোমার?" রাজশেখর হালকা চালে প্রশ্ন করলেন।

"ময়রাপাড়ায়।"

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রাজশেখরের। ময়রাপাড়া এবং সেখানকার লোকেদের তিনি চেনেন। "তোমার নাম কী? বাবার কী নাম?"

"বাবার নাম সাতকড়ি মোদক। আমার নাম করুণাময়ী।"

রাজশেখর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে গেলেন, "তুমি সাতুর মেয়ে!... কানাই পাইকের নাতনি!...তাই বলো। সিংহিবাড়ির আদবকায়দা কোথা থেকে জানলে, এবার আমি বুঝতে পারছি।"

"ঠাকুর্দাকে আমার মনে নেই। এ বাড়িতে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে অনেকবার এসেছি।"

"তোমার ঠাকুর্দাকে আমার মনে আছে। তোমাকে দেখে এখন আরও মনে পড়ছে।" রাজশেখর কৌতুকের ছলে বললেন। শুনে করুণাময়ী তার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল চেহারাটাকে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোট করে নেওয়ার চেষ্টা করল, এর পর রাজশেখর খুঁটিয়ে জেনে নিলেন করুণাময়ীর বর্তমান অবস্থা, শেষে বললেন, "কলকাতায় যাবে আমার সঙ্গে?" করুণাময়ী একটুও না ভেবে বলল, "যাব।"

চারদিন পর রাজশেখর মোটরে কলকাতা রওনা হলেন। পেছনের সিটে একটা পুঁটলি কোলে নিয়ে বসে অপুর মা। গাড়ি তারকেশ্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে তারকনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে। রাজশেখর তখন সামনের সিট থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, "তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। অপুর সব ভার আজ থেকে আমার। শচীনকে বলে এসেছি, ওর খাওয়াপরা, বইপত্তর, জামাজুতোর জন্য যা টাকা লাগবে সব দিয়ে আসবে।"

কলাবতী যেদিন বলল, "বলব কী পিসি সে কী বড়িভাজা" পরের শনিবারই অপুর মা নিজে থলি হাতে পাড়ার মুদির দোকানে গিয়ে দু-তিনরকমের ডাল, কালোজিরে, পোস্ত আর হিং কিনে আনল। ডাল ভিজিয়ে রাখল গামলায়। পরদিন সকালে রান্নাঘরের কাজের বউ শকুন্তলাকে বলল, "আজ আর তোকে অন্য কাজ করতে হবে না, ডালগুলো বাট।" শীর্ণ, দুর্বল চেহারার শকুন্তলা ডাল বাটছে রান্নাঘরের এক কোণে, আর অপুর মা গ্যাসের উনুনে বসানো কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছে। একসময় সে বলল, "ও কী বাটনা হচ্ছে, নোড়াটা ভাল করে চেপে ধরে বাট। গতরে কি জোর নেই? ক্ষীরের মতো মিহি না হলে কি বড়ি হয়?"

তারপর গজগজ করতে করতে বলল, "ধুপুর মা'র ভাজাবড়ি খেয়ে কালুদিদি মুচ্ছো গেছে! অমন বড়ি নাকি পিথিবিতে আর কেউ তৈরি করতে পারে না।...অ্যাই, তখন থেকে তুই চন্দন কাঠ বুলোবার মতো শিলে নোড়া ঘষছিস। ওঠ, ওঠ।" শকুন্তলাকে তুলে দিয়ে অপুর মা বসল ডাল বাটতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তিন কেজি মটর, বিউলি আর মুসুর ডাল কাদার মতো করে দিয়ে শকুন্তলাকে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, গামলাটা নিয়ে আয়, ফ্যাটাতে হবে।"

তিনতলার ছাদে শুরু হল বড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান। বড় একটা শীতলপাটির ওপর রাজশেখরের পুরনো একটা লন্ড্রিতে কাচানো ধুতি বিছিয়ে রাখা। সারি দেওয়া থালায় স্তূপ করে রাখা নানান রকমের বাটা ডাল। তার কোনওটা ভাজা বড়ির জন্য, কোনওটা মশলা বড়ির, কোনওটা পলতা বড়ির, কোনওটা লাউ দিয়ে বাটা, কোনওটা শুধুই পোস্তর। এক-একটা স্তূপের এক-এক রং। অপুর মা স্নান করে পাটভাঙা থান পরে একটা রেকাবিতে ধান, দূর্বা আর সিঁদুর নিয়ে বসল। পাশে উবু হয়ে বসে কলাবতী, তার পাশে দাঁড়িয়ে শাঁখ হাতে শকুন্তলা,একটু দূরে সিঁড়িঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রাজশেখর তাঁর পাশে মুরারি।

অপুর মা হিং দেওয়া মশলা বড়ির জন্য বাটা ডালের স্তূপ থেকে খানিকটা তুলে বিছানো কাপড়ের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মন্দিরের চূড়ার মতো করল, সাইজটা হল একটা বড় জামরুলের মতো।

"এটা হল বুড়ো।" অপুর মা ফিসফিস করে কলাবতীকে জানিয়ে দিল, "এবার ওর পাশে বসবে বুড়ি।"

অপুর মা বুড়োর পাশে আর একদলা ডালবাটা বসাল। তারপর বুড়োবুড়ির মাথায় ধান-দূর্বা চড়াবার সময় শকুন্তলার দিকে তাকাল। শকুন্তলা তাড়াতাড়ি শাঁখে ফুঁ দিল। বুড়োবুড়ির ওপর সিঁদুরের টিপ পরিয়ে অপুর মা জোড়হাতে প্রণাম জানাল।

"কালুদি প্রণাম করো।" একটু জোরে ফিসফিস করল অপুর মা এবং সবাই শুনতে পেল।

কলাবতী তাড়াতাড়ি দু'হাত কপালে তুলল, শকুন্তলাও। তাই দেখে রাজশেখর এবং তাঁকে দেখে মুরারি হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

"পিসি, বুড়োবুড়ি দুটো খাওয়া যাবে?"

"যাবে।"

"কে খাবে?"

"বাড়ির কত্তা আর গিন্নি। তোমার দাদু আর তুমি খাবে।"

"এত ডালবাটা! সব বড়ি আজকেই দেবে?" কলাবতী অবাক হয়ে বলল।

অপুর মা বড়ি দেওয়া শুরু করেছে। মাথা নেড়ে বলল, "একদিনে এত দেওয়া যায় নাকি। আজ যতটা পারি দোব, বাকিটা কাল।" তারপর শকুন্তলাকে বলল, "এই ডালবাটা থালাগুলো সব রান্নাঘরে বড় ফ্রিজে ঢুকিয়ে দে।"

অপুর মা আর কলাবতী বাদে ছাদ থেকে সবাই নেমে যাওয়ার পর দু'জনে সিঁড়িঘরের দেওয়ালের ছায়ায় বসে রইল বড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য। তখন কথায় কথায় অপুর মা বলল, "এই এক ঝকমারির কাজ, বসে থাকো বড়ি আগলে। কাজকম্মো শিকেয় তুলে বসে থাকার লোক তখন পাওয়া যেত, সব সংসারে একটা করে বুড়ি থাকত। এখন না আছে ডালবাটার লোক, না আছে বড়ি দেওয়ার ছাদ, বড়ি পাহারা দেওয়ার বুড়িরাই বা কোথায়! আমার ছিল জেঠিমা, বাড়ির উঠোনে বড়ি দিয়ে ঘরের দাওয়ায় সারা দুপুর বসে থাকত একটা গুলতি আর ছোট ছোট পোড়া মাটির গুলি নিয়ে, কাকপক্ষী বড়ির কাছে এলেই গুলতি দিয়ে পটাং করে গুলি ছুড়ত, আর ধারেকাছে কেউ আসত না।"

"পিসি, তুমি গুলতি ছুড়তে পারো?"

অপুর মা ভ্রূ তুলে কলাবতীর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "পারি মানে? জেঠিমার গুলতি দিয়ে মাঠের ইঁদুর মেরেছি, সাপ মেরেছি, কোলা ব্যাঙ মেরেছি, ডাকাতও তাড়িয়েছি।"

"ডাকাত! কী করে?" বিস্ময়ে কলাবতীর চোখ কপালে উঠল।

"কী করে আবার,অন্ধকার রাতে চুপিচুপি গুলতি মেরে।"

"কোথায় ডাকাত পড়েছিল? তোমাদের বাড়িতে?"

"পাশের ভুলুকাকাদের বাড়িতে। বেশ পয়সাওলা কলকাতায় মিষ্টির দোকান, এখন আরও একটা করেছে চন্দননগরে. ডাকাত পড়ল রাত এগারোটা নাগাদ। এখনকার মতো ইলেকট্রিক আলো তো ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার, ডাকাতদের সঙ্গে কেরোসিনের মশাল

আর চার ব্যাটারির টর্চ। পাড়ার সবাই দরজা জানলা এঁটে ঠকঠক করে ঘরের মধ্যে কাঁপছে। জেঠিমা বলল,'কোরু,গুলতিটা আর গুলি নে কোঁচড় ভরে। চল আমার সঙ্গে, দেখি মুখপোড়াদের মুরোদ কত? গুলতি তো নিলুম। গুলি দেখি দুটো মাত্তর রয়েছে। জেঠিমা বলল, 'ঠিক আছে। আমার তক্তপোশের নীচে কৌটোয় খোলা ছাড়ানো আস্ত সুপুরি আছে,তাই নিয়ে আয়।' এক-একটা সুপুরি গুলির সাইজের, কৌটোটাই হাতে তুলে নিলুম। জেঠিমা আর আমি বেরিয়ে অন্ধকারে আদাড়ের কচুবনের বড় বড় পাতার আড়াল দিয়ে," অপুর মা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে এমনভাবে বলল, এই ভরদুপুরে কলাবতীর গা ছমছম করে উঠল। ঢোক গিলে সে বলল, "তারপর পিসি?"

"তারপর আমরা কাদা মাড়িয়ে ফণিমনসা গাছ ঠেলে পৌঁছলুম ভুলুকাকাদের কলাবাগানে। তখন দরজা ভাঙার আওয়াজ, ঘরের মধ্যে চিৎকার কান্না 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, কে আছ বাঁচাও গো' চলছে আর ডাকাতদের দাবড়ানি শুনতে পাচ্ছি 'দরজা খোল, দা দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে রেখে যাব।' দেখলুম হাত তিরিশেক দূরে উঠোনে মশাল হাতে খালি গায়ে পেল্লায় চেহারার একটা ডাকাত দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

কলাবতী তাড়াতাড়ি বলল, "মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা?"

অপুর মা থমকে গেল, "তুমি জানলে কী করে?"

"পড়েছি। বিশে ডাকাত কপালে লাল ফেট্টি বাঁধত।"

"বিশে ডাকাত কে?" অপুর মা বিভ্রান্ত মুখে জানতে চাইল।

"সে একজন ছিল দেড়শো-দুশো বছর আগে। রনপায়ে চড়ে এক ঘণ্টায় দশ ক্রোশ চলে গিয়ে ডাকাতি করে রাত থাকতে-থাকতেই ফিরে আসত। যাকগে সে-কথা, তোমরা তারপর কী করলে?"

"তারপর আবার কী করব। জেঠিমা আমাকে বলল, 'কলাগাছের গা ঘেঁষে থির হয়ে কলাগাছের মতো দাঁড়া, একদম নড়বি না, গুলতিটা হাতে নে, সুপুরি লাগা, তারপর টিপ করে ডাকাতটার কপালে মার।' দুটো কলাগাছের মধ্যিখানে দাঁড়ালুম গুলতিতে সুপুরি লাগিয়ে, রবাটটা এই নাক পর্যন্ত টেনে এক চোখ বন্ধ করে টিপ করে রবাটটা ছাড়তে যাব আর তখুনি ডাকাতটা মাথা নিচু করে পা চুলকোতে লাগল। চুলকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে আমি আর দেরি করলুম না। দিলুম রবাটের ছিলেটা ছেড়ে, কী বলব কালুদি,একেবারে বন্দুকের গুলির মতো সুপুরিটা ওর রগে গিয়ে খটাস করে লাগল। 'বাবা গো' বলে ডাকাতটা কপালে হাত চেপে উবু হয়ে বসে পড়ল। দেখি কপাল ফেটে রক্ত বেরোল। 'কী হল কী হল' বলে ছুটে এল দুটো ডাকাত।

"জেঠিমা আমার হাতে আর একটা সুপুরি দিয়ে বলল, 'আবার মার।' যেটা রোগা ঢ্যাঙা সেটার মাথা তাক করে ছুড়লুম। এটাও 'উরিব্বাস' বলে মাথায় হাত দিয়ে এধার-ওধার তাকাতে লাগল। জেঠিমা আর একটা সুপুরি হাতে দিল। এবার মশাল হাতে করা লম্বা নেকো ডাকাতটার নাক লক্ষ্য করে ছুড়লুম, লাগল গিয়ে নাকের এক আঙুল পাশে, ব্যস, ধপাস, মশাল পড়ে গেল হাত থেকে। একজন টর্চের আলো এধার-ওধার করে খুঁজতে শুরু করল। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। মাথার ওপর দিয়ে আলো ঘুরে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাতটার কান লক্ষ্য করে আর একটা ছুড়লুম, কান চেপে ধরে সে লাফিয়ে উঠে টর্চ ফেলে ভয়ে দৌড় লাগাল। ডাকাতরা ততক্ষণে বুঝে গেছে—আড়াল থেকে কেউ তাদের মারছে। ওরা তখন ভাবল, গ্রামের লোক বোধ হয় ওদের ঘিরে ফেলেছে। বাড়ির মধ্যে যারা দরজা ভাঙছিল, শিস দিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে চম্পট দিল।"

"তোমরা তারপর কী করলে?"

"যেভাবে এসেছিলুম ঠিক সেইভাবে চুপিসারে বাড়িতে চলে এলুম। জেঠিমা কানে কানে বলল, 'খবরদার, কোরু, কাউকে গপ্পো করবি না। পাঁচকান হতে হতে ঠিক ডাকাতদের কানে পৌঁছে যাবে। ওদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি আমরা, এর শোধ ওরা নেবেই। জানতে পারলে কেটে কুচি কুচি করে রেখে দেবে।' শুনেই তো ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল, কাঠের গুলতিটা পুড়িয়ে ফেললুম। চল্লিশ বছর পর আজ এই প্রথম তোমার কাছে মুখ খুললুম। তুমি কিন্তু কাউকে কিছু বোলো না।"

অপুর মা'র মুখ দেখে কলাবতী আর হাসি চাপতে পারল না। খুক খুক করে হেসে উঠল। "চল্লিশ বছর পরও তোমার ভয় গেল না পিসি। ওসব ডাকাতরা তো এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেছে।"

"ভয় তো ওই ভূতকে নিয়েই। ওদের মধ্যে দু'জন, রাম বাগদি আর ভজা দুলে আর এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে গ্রামের লোকের হাতে ধরা পড়ে। তখন তো ডাকাত ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলার চল ছিল না। পুলিশের হাতে তুলে দিত। ওদেরও পুলিশে দেয়। কোর্টে বিচার হয়, দশ বছর জেল খাটে। রাম মরে গেছে, ভজা বেঁচে আছে। ওটাকেই ভয়।...তার থেকেও এখন ভয় ওই ওটাকে।" এই বলে অপুর মা ছাদের পাঁচিলের দিকে আঙুল তুলল। একটা কাক বসে রয়েছে।

"এই হতচ্ছাড়ারা আমার বড়ি নষ্ট করতে এসেছে। যাও তো কালুদি, দৌড়ে দাদুর লাঠিটা নিয়ে এসো।"

কলাবতী দোতলা থেকে রাজশেখরের তিনটে ছড়ির মধ্য থেকে একটা নিয়ে এল, অপুর মা ছড়িটা শূন্যে সপাত সপাত আছড়ে ছাদের মেঝেয় ঠকঠক শব্দ করতেই কাকটা শুধু পাঁচিলের একধারে হাতদুয়েক সরে মাথা ঘুরিয়ে অপুর মার দিকে তাকিয়ে রইল।

"গুলতি থাকলে বাছাধনের এই অগ্রাহ্যি করা ঘুচিয়ে দিতুম।" গজগজ করল অপুর মা।

"একটা গুলতি তৈরি কোরো না পিসি।" আবদারের সুরে বলল কলাবতী।

"বললেই কি তৈরি করা যায়।" অপুর মা দুটো আঙুল ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো দেখিয়ে বলল, "এইরকম দেখতে পেয়ারা গাছের শুকনো ডাল চাই আর চাই নরম রবাট। তুমি জোগাড় করে দাও, আমি তৈরি করে দোব।"

কাকটা আবার সরে এল পাঁচিলে আগের জায়গায়। উড়ে এল আরও দুটো কাক। অপুর মা ছড়ি ঘুরিয়ে মৃদু "হুশশ" করল। তিনটে কাকই নড়াচড়া করে বড়ির দিকে তাকিয়ে বারদুয়েক 'কা কা কা' ডেকে অপুর মার আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাল। সিঁড়িঘরের মাথা থেকে শালিকের কর্কশ ডাক উঠল। অপুর মা বিরক্ত হয়ে ওপরদিকে মুখ তুলে "জ্বালিয়ে মারলে!" মন্তব্য করে বাড়িসমেত শীতলপাটিটা সিঁড়িঘরের মধ্যে টেনে আনল।

"কাজকম্মো ফেলে এখন বড়ি পাহারা দেওয়া পোষাবে না। কালুদি পাটিটার একটা দিক ধরো, একতলার রকে নিয়ে যাই, ওখানে রোদ আছে।"

দু'জনে পাটিটা নামিয়ে এনে উঠোনের ধারের রকের ওপর পাতল। ঘণ্টাখানেক অন্তত রোদ পাবে এখানে। মিনিট তিনেক পর কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "পিসি,ওই দ্যাখো আবার এসেছে।"

কলাবতী আঙুল দিয়ে দোতলার কার্নিসে বসা কাকটাকে দেখাল। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে থমথমে হয়ে গেল অপুর মা'র মুখ। কাকটা উড়ে এসে বসল ঠিক বড়ির ওপরের কার্নিসে। দু-তিনবার ভেংচি কাটার মতো ডাকল। এবার অপুর মা রান্নাঘর থেকে টুল এনে বসল পাটির ধারে হাতে ছড়িটা নিয়ে। মুরারিকে ডেকে বলে দিল, "আজ আর আমি ভাত বেড়ে দিতে পারব না কাউকে, মুরারিদা, তুমি ম্যানেজ করে দোতলায় খেতে দাও, আমি হতচ্ছাড়া কাকটার আস্পদ্দার শেষ দেখে ছাড়ব। বড়ি দিতে অনেক কষ্ট করতে হয়।"

যতক্ষণ না রোদ সরে যায় ততক্ষণ অপুর মা ছড়ি হাতে বসে থাকবে। কাকটা এবং তার সঙ্গে আরও দু-তিনটি, অতঃপর অপুর মা'র সঙ্গে ধৈর্যের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা না করে মিনিট পাঁচেক পরেই উড়ে গেল। কাকের স্বভাব সম্পর্কে অপুর মা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সে জানে এমন মশলা দেওয়া সুগন্ধি ডালবাটা কাকরা ভীষণ পছন্দ করে। ওরা তার ওপর ঠিক নজর রাখবে। যেই টুল থেকে উঠে যাবে অমনই উড়োজাহাজের মতো নেমে এসে—ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। সব বড়ি এঁটো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করবে।

মুরারি ভাত আর অন্যান্য ব্যঞ্জন নিয়ে রান্নাঘর থেকে দু'বার

দোতলায় উঠল। অপুর মা আড়চোখে দেখল সব রান্না মুরারি ঠিকঠাক নিয়ে গেল কি না। তারপরই চোখ পড়ল রান্নাঘরের দরজার দিকে। ধূসর রঙের একটা হুলো বেড়াল ধীরেসুস্থে রান্নাঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে উবু হয়ে বসে তৃপ্তিভরে ঠোঁট চাটল। হুলোটা রোজ একবার বাইরে থেকে এসে সিংহিবাড়িতে টহল দিয়ে যায়।

"সর্বনাশ করেছে।" অপুর মা আঁতকে উঠল, "রাতে কালিয়া করব বলে ভেটকি মাছ ভেজে রেখেছিলুম—" কথা শেষ না করেই ছড়ি হাতে অপুর মা তেড়ে গেল হুলো বেড়ালটার দিকে। হুলো হকচকিয়ে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, পিছু পিছু অপুর মাও। সেখানে সে অপুর মা'র হাতের ছড়ির এক ঘা খেয়ে রান্নাঘরের লাগোয়া কয়লার ঘরে ঢুকে গেল।

কলকাতায় সিলিন্ডারে ভরা রান্নার গ্যাস বাড়ি-বাড়ি চালু হওয়ার আগে রান্না হত কয়লার উনুনে। সেই সময় সিংহিবাড়িতে কয়লা আসত ঠেলাগাড়িতে একসঙ্গে পাঁচ বস্তা। সদর দরজা দিয়ে নোংরা কয়লার বস্তার ঢোকা বারণ ছিল। তাই রান্নাঘরের সঙ্গে জুড়ে উত্তরে বাগানের দিকে একটা ছোট ঘর বানানো হয় কয়লা রাখার জন্য। তাতে থাকত ঘুঁটে এবং লকড়িও। কয়লার ঘরটায় একটা ছোট দরজা করা হয় যেটা দিয়ে বাইরে থেকে বস্তা নিয়ে ঢুকে কুলিরা কয়লা ঢেলে দিয়ে যেত। কয়লার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই ঘরে অন্তত তিরিশ বছর কারও ঢোকার দরকার হয়নি। বাইরে যাওয়ার দরজাটার খিলও তাই দেওয়া থাকে।

বেড়ালকে তাড়া করে অপুর মা কয়লার ঘরে ঢুকে দেখল বাগানে বেরোবার পুরনো দরজাটার তলার কাঠ পচে ছোট্ট একটা গর্ত হয়ে রয়েছে। হুলোটা সেই গর্ত দিয়ে প্রাণভয়ে কোনওক্রমে গলে বাইরে চলে গেল। রান্নাঘরে এসে অপুর মা দেখল মুরারি মিটসেফ খুলে রেখে গেছে এবং ভাজা ভেটকি মাছের বড় চারটে টুকরো কম, পড়ে আছে মাত্র দুটি টুকরো। কপালে হাতের চাপড় দিয়ে অপুর মা চিৎকার করে উঠল, "মুরারিদা, শিগগিরি এসে দেখে যাও কী কাণ্ড তুমি করেছ!"

দোতলায় খাবার টেবল থেকে রাজশেখর, সত্যশেখর ও কলাবতী ছুটে বারান্দায় এসে রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল।

"কী হল অপুর মা, অমন করে চেঁচালে কেন?" রাজশেখর উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলেন।

"উফ্‌ফ্‌, কী গলা রে বাবা, ডাকাতদেরও পিলে চমকে যাবে।" সত্যশেখর এঁটো হাত চাটতে চাটতে বলল।

" কী হয়েছে, কী হয়েছে" বলতে বলতে মুরারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রকের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল, "কাণ্ড যে এদিকে হয়ে গেল অপুর মা, শিগগিরি এসে দেখে যাও।"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে অপুর মা তার বড়ির দিকে তাকিয়েই থ হয়ে রইল। বড়িগুলো ছত্রখান। দুটো কাক বড়িগুলো মাড়িয়ে কাপড়ের ওপর হেঁটে হেঁটে কপাকপ করে বড়ি গিলছে। এই দৃশ্য দেখে অপুর মা'র মুখ দিয়ে আর স্বর বেরোল না, মুহ্যমানের মতো থপ করে টুলে বসে পড়ে অস্ফুটে শুধু বলল, "খা খা, সব খেয়ে নে।"

মুরারিই বরং হইহই করে কাক তাড়িয়ে পাটিটা টেনে সরিয়ে এনে বলল, "কেমন পাহারা দিচ্ছিলে? এবার বড়িগুলো তুমিই খেয়ো। হুঁশ রাখোনি কাক শালিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।"

গম্ভীর শান্ত গলায় অপুর মা দাঁত চেপে বলল, "খাব, আমিই খাব। আর মাছের যে দুটো টুকরো পড়ে আছে সে দুটো তুমি খেয়ো।"

"দুটো পড়ে আছে? ছ'টা ছিল তো!"

"ছিল। যদি হুঁশ রাখতে বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা হলে মিটসেফটা হাট করে খুলে রেখে যেতে না।"

মুরারি চমকে উঠে রান্নাঘরে দৌড়ল এবং ফিরে এসে মাথার চুল টেনে বলল, "মানিকতলা বাজারে ওই একটাই এতবড় ভেটকি আজ এসেছিল, তিন কিলোর। কাটিয়ে পেটি থেকে আধ কিলো আনলুম ছোটবাবুর কথা ভেবে।" এর পরই সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কোথায় গেল সেই মা ষষ্ঠীর বাহন, আজ ওর পিণ্ডি চটকে ছাড়ব।"

"আজ কেন, পনেরোদিন ওর ন্যাজের ডগাটিও দেখতে পাবে না।" অপুর মা এর পর মনোযোগ দিল বড়ির দিকে, "কত সাধ করে বড়ি দিলুম কালুদিদিকে খাওয়াব বলে। ঠিক আছে, এখনও তো ডালবাটা অনেকটা ফ্রিজে তোলা আছে, কাল আবার আমি বড়ি দোব, এবার দেখি বাছাধন আমাকে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে পালাতে পারে কিনা। থাকত যদি এখন আমার সেই গুলতিটা তা হলে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতুম।" চল্লিশ বছর আগের গুলতিটার কথা মনে পড়তেই অপুর মা'র মাথায় রক্ত ছুটে গেল। বিড়বিড় করল দাঁতে দাঁত চেপে, "ডাকাত তাড়িয়েছি আর কাক তাড়াতে পারব না।"

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপুর মা'র কথা শুনে রাজশেখর হাসছিলেন। পাশে দাঁড়ানো সত্যশেখরকে বললেন, "ভীষণ রেগে গেছে। দ্যাখ, ঠিক এবার একটা গুলতি বানিয়ে কাক মারবে, কানাই পাইকের নাতনি তো।"

"জানো দাদু, পিসি ছেলেবেলায় গুলতিতে সুপুরি লাগিয়ে ডাকাতদের মেরে তাড়িয়েছিল। হ্যাঁ, সত্যি বলছি, পিসি আজই আমায় বলল।"

"গুল মেরেছে।" গম্ভীর স্বরে কথাটা বলে সত্যশেখর খাবার টেবলে ফিরে গেল। তার পিছু পিছু কলাবতীও এসে খাবার টেবলে বসল।

"কাকা, তুমি ও-কথা বললে কেন?"

"বললুম এজন্য যে, গুলতি মেরে ডাকাত তাড়ানো যায় না, ছিঁচকে চোর হয়তো তাড়ানো যায়। ডাকাতদের সঙ্গে কীসব অস্ত্র থাকে জানিস?"

"জানি। লাঠি, বন্দুক, রামদা, তীর-ধনুক, তরোয়াল।" কলাবতী নামতা পড়ার মতো বলে গেল।

"ওসব ছিল বাজপাখি, রোঘো, বিশে আর কালোপাঞ্জার আমলের অস্ত্র। এখন ওদের সঙ্গে থাকে বোমা, পিস্তল, পাইপগান, রিভলভার, ভোজালি। তখন ছিল রনপা, এখন মোটরবাইক। অপুর মা একবার এদের সামনে পড়ুক, বোমা মেরে গুলি করে গুলতির দফা রফা করে দেবে... কালু দ্যাখ তো ওটায় ফুলকপির মতো কী যেন একটা রয়েছে।" সত্যশেখর আঙুল দিয়ে টেবলে রাখা চিনেমাটির বৌলটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

কলাবতী মাথা কাত করে তাকিয়ে দেখে বলল, "কড়াইশুঁটি, টম্যাটো, ফুলকপি আর ভেটকি মাছ দিয়ে কী যেন একটা রান্না। ঘি-গরম মশলার দারুণ একটা গন্ধ পাচ্ছি।"

শুনেই সত্যশেখরের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"বাবা টেবল থেকে উঠলে আর বসেন না, সেকেলে বুর্জোয়া জমিদারি কেতা। তুই তো ভেটকি মাছ একদমই পছন্দ করিস না, নিশ্চয় এটা খাবি না। তা হলে বৌলটা আমার দিকে ঠেলে দে।"

তাজ্জব বিভ্রান্ত কলাবতী প্রতিবাদ করে উঠল, "কাকা, আমি ভেটকি মাছ ভীষণ ভালবাসি।"

সত্যশেখর হতাশ স্বরে বলল, "অ্যা ভালবাসিস। আমি তো জানতাম তুই শুধু গলদা চিংড়ি ভালবাসিস।"

"শুধু গলদা কেন, ভেটকি, ইলিশ, ট্যাংরা, গুলে, আড়, পার্শে সব ভালবাসি। তুমি একাই পুরোটা খাবে তা কিন্তু হবে না। মনে রেখো এটা তিনজনের জন্য পিসি রেঁধেছে।"

"ঠিক আছে, তা হলে দু'জনেই শেয়ার করে খাব। রাতে তো মাছ পাব না, বেড়ালে খেয়ে গেছে। কালু এই বেড়াল আর কাকদের শায়েস্তা করা দরকার। পাকা ভেটকি মাছের পেটি একটা রেয়ার জিনিস, কত কষ্ট করে মুরারি কিনে আনল, আর সেটার অর্ধেকটা কিনা একটা জানোয়ারের পেটে চলে গেল। এসব এদেশেই সম্ভব।"

"কাকা, তুমি কথায় কথায় এদেশ নিয়ে খোঁটা দিয়ে বিলেত টেনে আনো। কই বড়দি তো একবারের জন্য বিলেতের নামও উচ্চারণ

করে না। অথচ তোমরা দু'জনে একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে থেকেছ, তুমি ব্যারিস্টার হয়েছে, বড়দি এডুকেশনে ডক্টরেট করেছে।"

কলাবতীর মৃদু ভর্ৎসনা শুনে সত্যশেখর মুখ নামিয়ে বলল, "হয়েছে, হয়েছে, বড়দির গুণ আর গাইতে হবে না, বৌলটা এদিকে ঠেলে দে।"

বৌলটা কাকার দিকে সরিয়ে দিয়ে কলাবতী বলল, "পিসি কাল হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধাবে।"

সত্যশেখর জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল, "কীরকম?"

"আবার বড়ি দিতে বসবে, আবার কাক আসবে, পিসি আবার দাদুর ছড়িটা নিয়ে ডাকাতে-গলায় হুঙ্কার দিয়ে কাক তাড়াবে।"

"কালু, তোর শেয়ারটা তুলে নে, নইলে ভুল করে পুরোটাই খেয়ে ফেল। দারুণ রেঁধেছে। হ্যাঁ রে, হঠাৎ বড়ি দেওয়ার শখ হল কেন অপুর মা'র?"

বৌল থেকে চামচ দিয়ে মাছ কপি আলু ইত্যাদি নিজের প্লেটে তুলে নিতে নিতে কলাবতী বলল, "পিসিকে বলার মধ্যে শুধু বলেছিলুম, টিফিনে ধুপু খিচুড়ি খাচ্ছিল বড়িভাজা দিয়ে। ওর মা বাড়িতে বড়ি দিয়েছিলেন। আমি খানিকটা খিচুড়ি আর গোটাচারেক ভাজাবড়ি খেলুম মানে ধুপুর অফারটা আর ফেরালুম না।"

"খুব ভাল করেছিস, দুপুরে যা খিদে পায় স্কুলে! একটা টিনের তোরঙ্গয় গরম মাংসের প্যাটিস নিয়ে রহমান বসত টিফিনের সময় স্কুল গেটে। গোটাচারেক খেয়ে মনে হত কিছুই খাওয়া হল না। গোটা তোরঙ্গটাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করত কিন্তু পকেটে তো আর পয়সা নেই।"

তিরিশ বছর আগে খাওয়া রহমানের প্যাটিসের স্বাদটা আবার জিভে অনুভব করার চেষ্টা করে সত্যশেখর বলল, "যেমন মুড়মুড়ে তেমনই টেস্টি, কত তো দোকান পার্ক স্ট্রিটে, দূর দূর, একটাও কেউ রহমানের তোরঙ্গের কাছে লাগে না।" এই বলে সে চামচের দিকে হাত বাড়াল।

"আমিও তো ঠিক এই কথাই বলেছিলুম পিসিকে, কী দারুণ বড়িভাজা, মোহন্তর পকৌড়িকেও হার মানিয়ে দেবে। ব্যাসস, পিসির আঁতে ঘা পড়ল। অন্যের রান্নার প্রশংসা একদম সহ্য করতে পারে না সেটা তো তুমি জানো।"

"জানি বলেই তো সেদিন অপুর মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললুম, কী দারুণ ধোঁকার ডালনা খেলুম হাইকোর্ট পাড়ার ফুটপাথের হোটেলে। মনে আছে তোর?"

"খুব মনে আছে, পরের দিন রাতেই তো...কাকা ও মাছটা কিন্তু আমার শেয়ারের।" কলাবতী হাত তুলে কাকাকে থামিয়ে দিল। অপ্রতিভ সত্যশেখর তাড়াতাড়ি চামচে তোলা ভেটকির টুকরোটা বৌলে নামিয়ে রেখে বলল, "বলেছিলুম তো আমার ভুলো মন। ধোঁকাটা অপুর মা রেঁধেছিল কেমন বল তো?"

"তুলনাহীন অতুলনীয়।"

"কারেক্ট। ম্যাচলেশ, ভোজনবিলাসীর সুখানন্দ। কালু, বাংলাভাষাটা আমিও জানি রে। পারিস তো ওর কাছ থেকে রান্না শিখে নে।"

"ওরে বাবা রান্নাঘরের ধারেকাছে আমায় ঘেঁষতে দেয় না। বলে রং কালো হয়ে যাবে। গরম তেলের ছিটে লেগে ফোসকা পড়ে দাগ হবে। আচ্ছা কাকা, আমার এই গায়ের রং আরও কি কালো হওয়া সম্ভব?"

"কালু, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, তুই যত কালো হবি ততই তোকে সুন্দর দেখাবে। পিসিকে পটিয়েপাটিয়ে ওর অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যা। কী জিনিস যে বাবা আটঘরা থেকে তুলে এনেছেন! শুধু ওর গলার ডেসিবেলটা যদি আদ্দেক কমানো যেত!" সত্যশেখর মাথা নাড়ল আফসোসে।

"দাদু তো পিসিকে এনেছে কানাই মোদকের নাতনি আর ছোটবেলার বন্ধু সাতকড়ির মেয়ে বলে। কানাই মোদক ছিল আটঘরার লেঠেলসর্দার। তার মানে ডাকাতের ওপরেও তার এক কাঠি। দাদু বলেছিল ওর চেহারা আর গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় দেখা কানাই পাইককে। তারপর যখন শুনলাম সাতকড়ির মেয়ে, তারপর আর দ্বিতীয় চিন্তা করতে হয়নি।"

"কিন্তু এখন তো অপুর মাকে তৃতীয় চিন্তা করতে হবে বড়ি নিয়ে।"

"তৃতীয় কেন?"

"দ্বিতীয় চিন্তা তো আবার বড়ি দেওয়া, তৃতীয় চিন্তা বড়ি রক্ষার জন্য গুলতি তৈরি করা।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে খাওয়া শেষ করল। বড়ি নষ্ট বা বেড়ালের মাছ খেয়ে যাওয়াটাকে দু'জনেই কোনও গুরুত্ব দিল না বরং হাসাহাসি করল গুলতি মেরে অপুর মা'র ডাকাত তাড়ানোর গল্প নিয়ে।

গুলতির জন্য শ্যামার কামারশালে

অপুর মা'র জেদ আর গোঁয়ার্তুমি যে শুধু সুখের কথা নয় সেটা বিকেলেই কলাবতী বুঝে গেল।

"কালুদিদি, আমার সঙ্গে চলো তো পেছনের মালোপাড়া বস্তিতে, মুরারিদা বলল এখানে একটা কামারশাল আছে।" অপুর মা'র স্বরে তাড়া কথার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা। ধবধবে দামি থানের ওপর গায়ে মুগার চাদর জড়ানো, পায়ে চামড়ার চটি। বাড়ির বাইরে বিশেষ কাজে যেতে হলে অপুর মাকে এই সাজে যেতে হয় রাজশেখরের নির্দেশে।

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, "কামারশাল সে আবার কী? সেখানে যাবে কেন?"

আরও অবাক হয়ে অপুর মা বলল, "সে কী, কামারশাল কী জানো না! সাঁড়াশি, খুন্তি, হাতা, সাঞ্চা, চাটু গজাল, লাঙলের ফলা আংটা এইসব কামারেরা যেখানে তৈরি করে তাকেই কামারশাল বলে। আমাদের আটঘরায় ছিল সুয্যিকামার, ওর বাড়িতেই ছিল কামারশাল। একহাত দিয়ে সে মাঝে-মাঝে হাপর টেনে হাওয়া চালিয়ে কয়লার আগুন উসকে গনগনে করত, আর অন্য হাতে সেই কয়লার মধ্যে ঢোকানো লোহাটাকে সাঁড়াশিতে ধরে উলটেপালটে দিত। লোহা লাল টকটকে হলে তখন লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নেহাইয়ের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করত কি বাঁকিয়ে গোল করত।

"ডাকাতে কুনুকাকার ঘরের দরজার লোহার হুড়কো ভেঙে দিয়েছিল। সুয্যিকামার পরের দিনই নতুন একটা বানিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে মোটা একটা শিকলও। তোমাকে মুখে বলে কামারশাল বোঝাতে পারব না, এখন চলো তো আমার সঙ্গে, মুরারিদাকে বললুম আমাকে কামারশালটা একবার দেখিয়ে দাও, তাইতে বলল বুড়ো বয়সে ওসব ছেলেমানুষি খেলনা তৈরি করে দিতে বললে কামারটা তো হেসে গড়াগড়ি খাবেই আর মালোপাড়ার বাচ্চারা আমাকে দেখলেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে 'বুড়োখোকা গুলতি ছোড়ে, বুড়োখোকা গুলতি ছোড়ে।' মুরারিদা তাই বলল, যেতে হয় তুমি একাই যাও—আমি গুলতির মধ্যে নেই।"

এবার কলাবতী বুঝতে পারল পিসি কেন মালোপাড়ায় কামারশালে যেতে চাইছে। লোহার গুলতি বানিয়ে কাকেদের ভয় দেখিয়ে বড়ি রক্ষার জন্য পিসি যে এমন জেদ ধরবে সেটা শতচেষ্টা করেও সে কল্পনায় আনতে পারবে না। তার খুব মজা লাগল অপুর মা'র গম্ভীর উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে।

"মুরারিদার এমন কথা বলা খুব অন্যায় হয়েছে। গুলতি সব বয়সের মানুষই ছুড়তে পারে। পিসি, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি চটিটা পরে আসি, তোমার সঙ্গে যাব।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ল মালোপাড়ার উদ্দেশ্যে। সিংহিবাড়ির পশ্চিমে আট ফুট উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে মাটি আর খোয়ার সরু গলি চলে গেছে একটা পানাপুকুরের ধার দিয়ে দক্ষিণে, এটাকে বলা হয় পগার গলি। সেই পুকুরে গোটা মালোপাড়া কাপড় কাচে, বাসন মাজে এবং স্নান করে। বাড়ির ছাদ থেকে কলাবতী দেখেছে গরমের দিনে ছোট ছেলেমেয়েরা দুপুরে

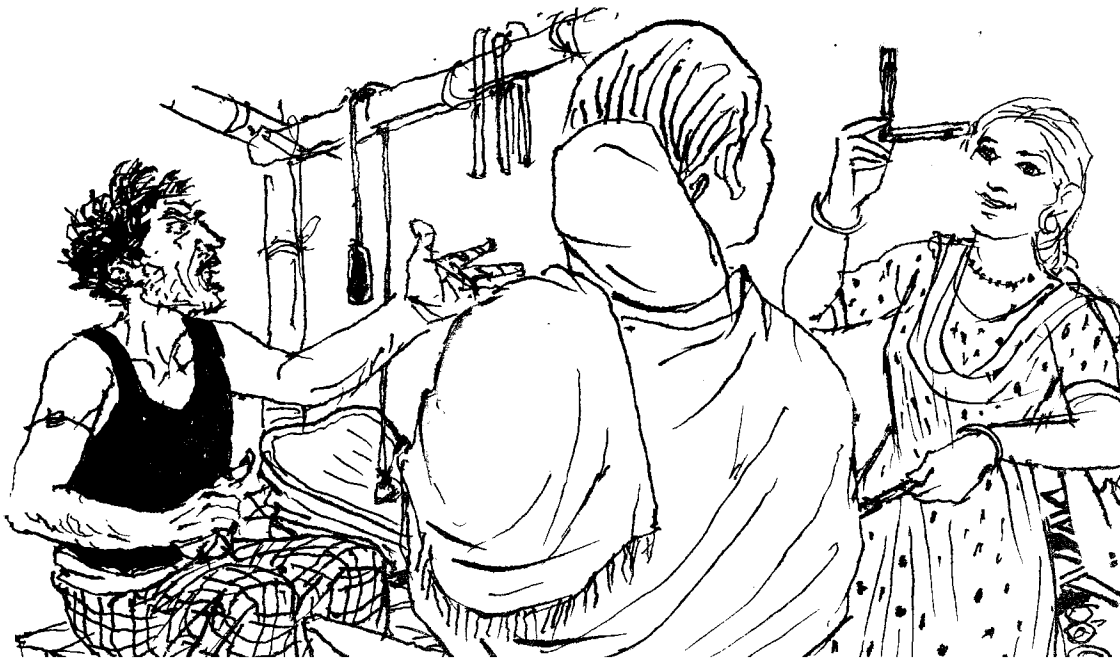

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাঁতারও কাটে। পুকুরটার ধারে একখণ্ড জমি, সেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলে বাঁশের পোস্ট পুঁতে, রবারের বল দিয়ে ক্রিকেটও খেলে। মাঠের ধারেই মালোপাড়া। পগার গলি দিয়ে ক্বচিৎ যাতায়াত করে লোকজন। পাঁচিলের একটা ছোট্ট একপাল্লার লোহার দরজা দিয়ে পগার গলিতে যাওয়া যায়। লোহার খিল দিয়ে দরজাটা বন্ধ থাকে। আজ সেই দরজা দিয়ে বেরোল কলাবতী আর অপুর মা।

পগার গলি দিয়ে তারা পুকুরধারের মাঠে এল। মাঠ পেরিয়ে তারা ঢুকল মালোপাড়া বস্তির মধ্যে। কলাবতী আগে কখনও বস্তি দেখেনি। চার হাত চওড়া মাটির রাস্তায় মুখোমুখি বাড়ি বা ঘরের সারি। রাস্তার ধারে খোলা নর্দমায় জমে রয়েছে থকথকে পাঁক। ইটের পাতলা দেওয়ালের ধারে ছোট ছোট জানলা, ঘরের ছাদ টিনের বা খোলার বা টালির। ঘরগুলো একটার সঙ্গে অন্যটা লেগে রয়েছে। অদ্ভুত একধরনের গন্ধ সে পেল, আগে যা কখনও তার নাকে লাগেনি। গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠল। চাপা গলায় সে বলল, "পিসি কোথায় কামারশাল? একটু তাড়াতাড়ি চলো।"

দু'জনে পা চালিয়ে দ্রুত এগোল। একটি ছোট মেয়ে দুটি বাচ্চা সমেত একটা ছাগল নিয়ে আসছে। তাকে দাঁড় করিয়ে অপুর মা জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে মেয়ে, এখানে কামারশালটা কোথায় জানিস?"

মেয়েটি চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "জানি না।"

সেই সময় দরজা খুলে বেরোল বয়স্কা এক স্ত্রীলোক, হাতে প্লাস্টিকের বালতি। কৌতূহলে সে অপুর মাকে জিজ্ঞেস করল, "কাকে খুঁজছেন?"

"শুনেছি এখানে একটা কামারশাল আছে।"

"আছে। কী করবেন সেখানে?"

'গুলতি করাব' বলতে গিয়ে থেমে ঢোক গিলে অপুর মা বলল, "সাঁড়াশি করাব।"

"ভেঙে গেছে বুঝি। আজকালকার সাঁড়াশির যা দশা, আমারটা দু-দু'বার ঢলঢলে হয়ে খুলে গেল। ওই শ্যামা কামারকে দিয়ে নতুন একটা তৈরি করালুম, তা আজ ছ'মাস হয়ে গেল এখনও বেশ টাইট আছে। ওর হাতের কাজ খুব ভাল, তবে গাঁজা না খেলে ও মন দিয়ে একদম কাজ করতে পারে না। আমি তো আট আনার গাঁজা কিনে দিয়ে একবেলার মধ্যে সাঁড়াশিটা করালুম। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তবে একটা কথা বলে রাখি, কামারশালটাল বলা ও কিন্তু পছন্দ করে না, বলতে হবে শ্যামাচরণের কারখানা। না বললে আপনার কাজ নাও নিতে পারে।"

স্ত্রীলোকটি এই বলে হাঁটতে শুরু করল। ওরা দু'জন পিছু নিল। প্রথম বাঁকটা ঘুরতেই পড়ল একটা বেলগাছ, তার নীচে টিউবওয়েল এবং প্লাস্টিকের জারিকেন, বালতি, মাটির কলসি, পেট্রলের টিন ইত্যাদির দীর্ঘ লাইন টিউবওয়েল থেকে থার্ড ব্র্যাকেটের মতো হয়ে রাস্তায় এসেছে, স্ত্রীলোকটা হাতের বালতি লাইনের শেষে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বউকে বলল, "ফুলি, বালতিটা দেখিস। আমি এদের শ্যামার কারখানায় পৌঁছে দিয়েই আসছি।" এই বলে সে ব্যস্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

শ্যামার কামারশাল বা কারখানা বস্তির আর একপ্রান্তে এবং বড় রাস্তার ধারে।

কলাবতী বলল, "পিসি, আমরা তো মানিকতলা মেন রোড দিয়েই আসতে পারতুম, মিছিমিছি বস্তির মধ্য দিয়ে আসতে হল। এই রাস্তা দিয়েই তো বড়দিদের বাড়ি যাওয়া যায়।"

"এর পর যখন আসব বড় রাস্তা দিয়েই আসব।"

একটা টালির চালের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "এইটেই শ্যামার কারখানা, ও ভেতরে রয়েছে। যান কথা বলুন।" তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি চারটে টাকা আর গাঁজা দিয়ে সাঁড়াশি করিয়েছি। আপনি কিন্তু এর বেশি দিয়ে রেট খারাপ

করে দেবেন না। ও যদি চায় দশ টাকা, আপনি তখন বলবেন তিন টাকা। তারপর দরকষাকষি করে রাজি হবেন চার টাকায়। মনে রাখবেন, তাড়াতাড়ি পেতে চান যদি, তা হলে ওই গাঁজাটা দিতে হবে। চললুম, খাবার জল নিয়ে ঘরে যেতে হবে।"

স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। অপুর মা বলল, "দেখলে কালুদিদি, মানুষটা কত ভাল। কী উপকারটাই না করল উপযাচক হয়ে। গরিব লোকেরাই এটা করে।"

পরিহাসের স্বরে কলাবতী বলল, "উপকার তো নিশ্চয়ই করল, কামারশাল না বলে কারখানা বলতে হবে, নয়তো অর্ডার নেবে না। আর আর্জেন্ট পেতে হলে আটআনার গাঁজা ঘুষ দিতে হবে, এই পরামর্শ দিয়ে উনি তো উপকারই করলেন।"

অবাক হয়ে অপুর মা বলল, "এটা উপকার করা নয়? আমার একটা লোহার গুলতি এখুনি চাই, বাগানে আজ দুপুরে দু-দুটো পেয়ারা গাছে কাটার মতো একটা ডালও পেলুম না, যা দিয়ে গুলতি বানানো যায়। কাঁচা কাঠের গুলতি তো মট করে ভেঙে যাবে, কাঠ শুকিয়ে শক্ত হতে হতে আমার বড়ি তদ্দিনে কাক শালিকের গব্বায় চলে যাবে।"

শ্যামা বনাম অপুর মা

কামারশাল বা কারখানার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপুর মা এবং কলাবতী কথা বলছিল, তখন ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের লক্ষ করছিল শ্যামাচরণ। কথা শুনতে পাচ্ছিল না কিন্তু দু'জনের কথা বলার ভঙ্গি থেকে সে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছিল। দশাসই অপুর মা'র পরনের ধবধবে থান ও গায়ে জড়ানো মুগার চাদর দেখে তার মনে হল এ নিশ্চয় বড়ঘরের গিন্নি আর সাধারণ সালোয়ার কামিজ, চটি পরা প্রসাধনহীন শ্যামলারঙের কলাবতীকে দেখে সে নিশ্চিত হল, এটা গিন্নির কাজের মেয়ে।

অপুর মা কামারশালের ভেতরে উঁকি দিল। ময়লা একটা ধুতি মালকোঁচা করে পরা, সেটায় জড়ানো কালিমাখা গামছা। ঊর্ধ্বাঙ্গে বগলকাটা কালো গেঞ্জি। গালে এক সপ্তাহের কাঁচাপাকা দাড়ি। মুখ শরীরের মতোই শীর্ণ এবং লম্বাটে। চুলে কখনও চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না। চোখ দুটি ঘন। ভুরুর নীচে ড্যাবড্যাবে এবং ঈষৎ লাল। শ্যামা উবু হয়ে বসে ছিল, অপুর মাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"কী চাই আপনার?"

"লোহার একটা গুলতি করে দিতে হবে।"

শ্যামার চোখ আরও গোলাকার হয়ে স্থির হয়ে রইল পাঁচ সেকেন্ড। অবশেষে বলল, "গুলতি! কার জন্য?"

"আমার জন্য।"

অপুর মা'র গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বর শ্যামাকে বুঝিয়ে দিল, ব্যাপারটা হালকা করে দেখা ঠিক হবে না।

"আমি তো জীবনে গুলতি তৈরি করিনি, ওসব আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়? গুলতি আপনি কি কখনও চোখে দেখেননি?"

"দেখেছি, ছেলেবেলায় আমার নিজেরই একটা ছিল, কাঠের। চড়কের মেলায় কিনেছিলুম। গুলতি দিয়ে পাথর ছুড়ে রাস্তার একটা কুকুরকে মারতেই সে আমাকে কামড়ে দেয়। ভাগ্যিস কুকুরটা পাগলা ছিল না। পরদিনই মা গুলতিটা নিয়ে উনুন ধরায়।"

অপুর মা বুঝে গেল শ্যামাচরণ কামার কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু এখন আজেবাজে কথা বলার সময় নয়। সে কাজের কথা পাড়ল। "আপনার কাজের এত নাম কত লোকের কাছে শুনেছি বলেই তো খুঁজতে খুঁজতে আপনার কারখানায় এলুম।"

কথাগুলো শুনে শ্যামার চোখ ভাললাগার আমেজে ছোট হয়ে কোটরে প্রায় ঢুকে গেল। কলাবতী এতক্ষণ ঘরটার চারধারে চোখ বোলাচ্ছিল। ছোট ছোট নানান আকারের লোহার টুকরো, কোনওটা গোল কোনওটা চ্যাপটা, কোনওটা 'দ' বা ইংরিজি 'জেড'-এর মতো, লোহার সরু ও মোটা পাত এক কোনায়, আর এক কোনায় কয়লা। মাটির মেঝেয় গর্ত করে কয়লার চুল্লি, চামড়ায় তৈরি হাপর থেকে একটা নল মাটির তলা দিয়ে গেছে চুল্লিটার নীচে। হাপরটাকে হাতল ধরে ওঠানামা করালে বাতাস যায় নল দিয়ে চুল্লিটার তলায়, গনগন করে ওঠে কয়লার আগুনের আঁচ।

শ্যামাচরণ ছোট্ট একটা নিচু টুলে বসে হাপরের হাতল ধরে ওঠানামা করাতে শুরু করল। ঝিমিয়ে থাকা চুল্লি থেকে দু'-চারটে ফুলকি ছিটকে উঠল।

"লোহা দিয়ে গুলতি বানানো সোজা কাজ নয়। আপনি কাঠ দিয়ে করে নিন, ছুতোর মিস্তিরির কাছে যান। আমার দুটো ঘর পরেই অনিল মিস্তিরির কারখানা, ওকে গিয়ে বলুন।" শ্যামাচরণ সহজ স্বরে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

"অ। তা হলে আপনি পারবেন না। তা হলে আপনার সম্পর্কে যা শুনেছিলুম তা সবই ভুল।" অপুর মা চিবিয়ে চিবিয়ে এমনভাবে কথাগুলি বলল যা শোনামাত্র শ্যামার মাথা চিড়চিড়িয়ে উঠল।

"কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে?" চড়া গলায় বলল শ্যামা।

অপুর মা তার গলা এক ডেসিবেল নামিয়ে বলল, "আপনি যে কাজ করেন তা খুব নিখুঁত আর টেকসই হয়, অবশ্য গাঁজার জন্য যদি আপনাকে আলাদা পয়সা দেওয়া হয়।"

শ্যামাচরণ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ চটে গেছে সে অপুর মা'র কথায়। বলল, "গাঁজা খাই তো বেশ করি। এইরকম আগুনের পাশে বসে দশ ঘণ্টা লোহা পিটোতে হলে আপনিও খেতেন।"

শুনে অপ্রতিভ হয়ে গেল অপুর মা। কিছুক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই তার মাথা ধরে আসে, তখন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে আসতে, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে, আর এ তো গনগনে আঁচের ধারে এমন বদ্ধ ঘরে দশ ঘণ্টা কাটানো। অপুর মা'র মন ভরে উঠল সহানুভূতিতে। সে বলল, "আমি আপনাকে দু'টাকা দোব গাঁজার জন্য, বলুন আমার কাজটা করে দেবেন কি না।"

ইতিমধ্যে কলাবতী ঘরের কোণে পড়ে থাকা নানা আকারের চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোহার টুকরো ঝুঁকে দেখছিল। টুকরোগুলো বাঁকানো, তার কোনওটা ৪৫ ডিগ্রিতে, কোনওটা একেবারেই গোল, কোনওটা সমকোণের। দেখেই বোঝা যায় এ-সবই শ্যামার হাতের কাজ। তৈরি করেছে কারও অর্ডার পেয়ে। কলাবতীর মনে পড়ল এই ধরনের লোহা সে দেখেছে পাড়ার হার্ডওয়্যারের দোকানে, কাকার সঙ্গে ছোট একটা হাতুড়ি কিনতে গিয়ে।

হঠাৎ সে দুটো এক ফুট লম্বা লোহা তুলে নিল, দুটোই ৪৫ ডিগ্রিতে বাঁকানো। সে দুটোকে একসঙ্গে জোড়া দিয়ে মুঠোয় ধরতেই আকার নিল ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের মতো। দু'হাত তুলে কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়ে গেছি, গুলতি পেয়ে গেছি।"

শ্যামাচরণ আর অপুর মা অবাক হয়ে কলাবতীর দিকে তাকাল।

"অ্যাই,অ্যাই মেয়েটা, রেখে দে, রেখে দে"— ধমকে উঠল শ্যামা, "একদম ওতে হাত দিবি না, দু'ডজন কালকের মধ্যে পৌঁছে না দিলে আমার পিণ্ডি চটকে দেবে ননীবাবু।"

শ্যামাচরণের ধমকানি কলাবতীর কানে ঢুকল না। সে উত্তেজিত হয়ে অপুর মা'র কাছে এসে জোড়া দেওয়া লোহা চোখের সামনে ধরল।

"ওম্মা তাই তো! এ তো ঠিক গুলতির মতোই!" কলাবতীর হাত থেকে লোহাদুটো প্রায় কেড়ে নিয়ে অপুর মা ছেলেমানুষের মতো গলায় শ্যামাকে বলল, "এ দুটো আপনি জুড়ে দিন,আপনি বরং পরে আর দুটো তৈরি করে নেবেন।"

শ্যামার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আবার ড্যাবড্যাবে হয়ে উঠল। খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তার মানে? জুড়ে দিন, তৈরি করে নেবেন, এ কি বেগুনভাজা না চাটনি করা? অ্যাই মেয়েটা, ও দুটো যেখানে ছিল সেখানে রেখে আয়। ওসব পরের জিনিস, আমার নয়।"

অপুর মা প্রমাদ গুনল, হাতের মুঠোয় এসে পাখি উড়ে পালাবে? মরিয়া হয়ে সে বলল, "কত টাকা নেবেন ও দুটোর জন্য? এ তো এক মিনিটের কাজ। গাঁজার জন্য পাঁচ টাকা দোব আর কালুদিদিকে তুই-তোকারি করবেন না, ও জমিদারবাড়ির মেয়ে।"

শ্যামাচরণ ভ্রূকুটি করল। অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে বলল, "কোথাকার জমিদার?"

"আটঘরার জমিদার, এই বস্তির পেছনেই ওদের বিরাট বাড়ি।" অপুর মা'র গলা গর্ব মিশিয়ে একটু চড়ল।

"সিংহিবাড়ি?"

"হ্যাঁ। জানেন দেখছি।"

"জানব না কেন, ও বাড়ির মুরারি তো দুখ্যু পেলে, মনখারাপ হলে মাঝেমধ্যে আমার এখানে এসে দু-চারটে টান দিয়ে যায়। লোকটা খুব সরল, দুটো টান দিয়েই বলে চাকরি ছেড়ে দোব, আর সহ্য করতে পারি না।"

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, "মুরারিদা এখানে মাঝেমধ্যে আসে গাঁজায় টান দিতে, পিসি এটা তো জানতুম না!"

"আমিও তো এই প্রথম শুনছি, তা চাকরি ছাড়বে কেন?"

শ্যামাচরণ টুলে বসে হাপরের হাতলটা ধরল। দু'বার ওঠানামা করিয়ে আঁচ উসকে দিয়ে বলল, "মুরারি খুব ভয়ে ভয়ে থাকে, জমিদারবাবু দেশ থেকে একজন মেয়েছেলেকে এনেছে, তার গলার আওয়াজ মিটিংয়ে বক্তিতার সময় মাইকের তিনটে চোঙা দিয়ে যে শব্দ বেরোয় তা এক করলে যা দাঁড়াবে ততটা আওয়াজ একসঙ্গে তার গলা দিয়ে বেরোয়। মুরারির হাট ভাল নয়, ও বলে, শ্যামা, শুনলে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, মনে হয় এবার মরে যাব। একবার যদি দেখা হয় তা হলে দেখতুম তার গলার জোর কতটা, ঠাণ্ডা করে দিতুম, আপনি কি জানেন সে মেয়েছেলেটাকে?"

শ্যামা তাকাল অপুর মা'র দিকে। মুখ থমথমে হয়ে গেছে রাগ চাপতে চাপতে। "হ্যাঁ জানি সেই মেয়েছেলেটাকে।" শান্তভাবে নিচু গলায় অপুর মা বলল, "কিন্তু কথাগুলো বেটপকা বলে ফেলে মুরারিদার যে কী সব্বোনাশ আপনি করলেন তা হয়তো জানেন না।"

শ্যামা অবাক হয়ে বলল, "কী সব্বোনাশ করলুম মুরারির?"

"মুরারিদা যে মেয়েছেলের কথা বলেছে, আমিই সেই। এবার আমায় কী ঠাণ্ডা করবি কর।" অপুর মা লোহাদুটো মুঠোয় ধরে এক পা এগিয়ে যেতেই শ্যামা টুল থেকে লাফিয়ে উঠল।

অপুর মা এবার ছাড়ল তার ডাকাতে গলাটাকে, "মেরে মাথা ফাটিয়ে দোব হতচ্ছাড়া। এক্ষুনি আমায় এ দুটো দিয়ে গুলতিটা তৈরি করে দে বলছি, নয়তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" সিংহি বাড়ির মেয়েকে তুই-তোকারি করা?"

কামারশালের দরজায় তিন-চারজন লোক হাজির হয়ে গেছে। তারা ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, এই ভেবে ইতস্তত করছে। একজন বলল, "শ্যামাদা হয়েছে কী? আবার খদ্দেরের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়েছ।"

শ্যামা জবাব দেওয়ার আগেই অপুর মা বলল, "হবে আবার কী, ছোটমুখে বড় কথা! কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না, গাঁজা খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। করে দাও বলছি।"

দরজা থেকে একজন বলল, "ও শ্যামাদা, ঝামেলা বাড়াচ্ছ কেন, করে দাও না, মাসিমা যা চাইছে।"

আর একজন বলল, "কী না কী হল রে বাবা, ভাবলুম ডাকাত পড়ল বুঝি, আজকাল তো মেয়ে-ডাকাতও হয়।"

আর একজন বলল, "দম মারাটা এবার একটু কমাও শ্যামাদা।"

গজগজ করে শ্যামা বলল, "সারাদিনে একটা টানও দিইনি আর বলছিস কি না দমমারা কমাতে? ভাগ, ভাগ এখান থেকে।"

দরজা থেকে লোকগুলো সরে যেতেই শ্যামা বলল অপুর মাকে, "মুরারি ঠিকই বলেছে। তিনটে চোঙার আওয়াজ আপনার গলায়। দেখি ও দুটো।" হাত বাড়িয়ে লোহাদুটো নিয়ে চুল্লিতে ঢোকাল। জোরে জোরে হাপর টেনে গনগনে করে তুলল চুল্লিটা। যখন তেতে লোহাদুটোয় কমলা রং ধরেছে তখন একটা একটা করে তুলে নেহাইয়ের ওপর রেখে সরু মুখ ছেনি দিয়ে লোহার ঠিক মাঝখানে দুটো করে গর্ত করল দুই ইঞ্চির ব্যবধানে। এর পর জলভরা একটা লোহার বালতির মধ্যে গরম লোহাদুটো ফেলে দিতেই ছ্যাঁক করে উঠে সাদা ধোঁয়া উড়ল।

"এ কী, জোড়া হল কই?" কলাবতী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

"আমার এখানে লোহা জোড়া লাগাবার জিনিস থাকে না, ওসব থাকে মোটর সারাইয়ের গ্যারেজে, যাকে বলে ওয়েল্ডিং। এই যে গত্তো করে দিলুম এবার লোহা দুটোকে একসঙ্গে ধরে ওর মধ্যে দিয়ে বল্টু আর নাট ঢুকিয়ে টাইট করে দিলেই জোড়ার কাজ হয়ে যাবে। এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে দশ পা গেলেই হার্ডোয়ারের দোকান, দুটো বল্টু আর দুটো নাট কিনে লাগিয়ে নেবেন।"

আঁচলের গিঁট খুলে অপুর মা দোমড়ানো একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলল, "এতে হবে?"

জবাব না দিয়ে শ্যামাচরণ নোটটা টুক করে টেনে নিয়ে বলল, "পাঁচটা টাকা আর দিতে হবে না। যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।"

কলাবতী বলল, "কী ক্ষতি হল আপনার?"

"মুরারির সব্বোনাশ করে ফেললুম। বেচারা হাটের রুগি, এখন তো উঠতে বসতে ওর কানের কাছে যে চোঙাগলার বক্তিতা বাজবে। বেচারা এবার মরেই যাবে।" শ্যামাচরণ টপ করে টুলে বসে হাপরের হাতল ধরল।

ওরা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে নাট-বল্টু কিনল, দোকানদারই সেগুলো টাইট করে লাগিয়ে দিতেই 'ওয়াই' হয়ে গেল লোহাজোড়া। কলাবতী বাঁ হাতে ওয়াইয়ের গোড়াটা মুঠোয় ধরে মুখের সামনে তুলে এক চোখ বন্ধ করে টিপ করল। তারপর ডান হাতে কাল্পনিক রাবারের ছিলে দু'আঙুলে চেপে ধরে টান দিয়ে ছেড়েই নিজের মনে বলে, "ঠকাস ... ডাকাতটার কপালে ... পড়ে গেল।" বলেই সে হেসে উঠল।

অপুর মা বলল, "একেই বলে গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল, কলকাতা কি আটঘরা যে, এখানে বাড়িতে ডাকাত পড়বে? তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, মুরারিদার সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

কলাবতী চলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, "না পিসি না, মুরারিদাকে তুমি কিছু বলতে পারবে না। দাদুর কাছে শুনেছি সত্যি-সত্যিই ওর হার্টের অসুখ আছে, মানুষটা খুব ভাল, সবাইকে ভালবাসে, তোমাকেও মেয়ের মতো ভালবাসে, ওকে তুমি কিছু বোলো না, প্লিজ পিসি।" অপুর মা'র হাত চেপে ধরল কলাবতী।

কিছুক্ষণ কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অপুর মা'র ঠোঁট পাতলা হাসিতে মুচড়ে গেল, বলল, "আচ্ছা, বলব না। তবে তোমাকেও কথা দিতে হবে এমন কাজের মেয়ের মতো সাজে কখনও বাড়ির বাইরে যাবে না।"

"তুমি কথা রাখলে আমিও রাখব।" কলাবতী পালটা শর্ত রাখল।

অপুর মা তাড়া দিয়ে বলল, "হয়েছে,হয়েছে, পা চালিয়ে বাড়ি চলো। কতক্ষণ বেরিয়েছি বলো তো!"

"তবে জানো কি কালুদি, এই গলার ওপর আমার তো কোনও হাত নেই, জন্মো থেকেই পেয়েছি। শুনেছি আমার ঠাকুদ্দার নাকি এমন গলা ছিল।"

হাঁটতে হাঁটতে অপুর মা বলে চলল, "ঠাকুদ্দা একটা হাঁক দিলে নাকি ছেলের কান্না বন্ধ হয়ে হেঁচকি উঠত, মাঠের গোরু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাত, ডাব পাড়তে ওঠা মানুষ গাছ থেকে পড়ে যেত।"

"আচ্ছা পিসি, তুমি কখনও ঠাকুর্দার মতো হাঁক দিয়েছ?" কৌতূহলে কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"ঠাকুদ্দার মতো কি না জানি না। তবে অপুর বাবা তো পাঠশালার মাস্টার ছিল। আমাদের বাড়ির পাশে মস্ত ধানখেত, তার লাগোয়া বিরাট একটা বিল, তারপর একটা গ্রাম, নাম বায়সা, পাঠশালাটা ছিল ওই বায়সায়, তা প্রায় আধ মাইল তো হবেই, তার বেশিও হতে পারে। অপুর বাবা তো ভাত না খেয়েই পড়াতে চলে যেত। দুপুরে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আমি ধানখেতের

ধারে গিয়ে বায়সার দিকে মুখ করে গলাটা একটু উঁচুতে তুলে তখন বলতুম...” অপুর মা এবার মুখের দু'পাশে দু'হাতের চেটো চোঙার মতো করে ফিসফিসিয়ে বলল, “ভাআত বেএড়েছিই, আর তখনই পাঠশালে টিপিন হয়ে যেত। গ্রামের পাঠশালে তো আর ঘড়ি থাকে না।”

কলাবতী মজা করে বলল, “পিসি, এখন তুমি অমন গলায় 'ভাত বেড়েছি' বলতে পারবে?”

“পাগল হয়েছ!” সিংহিবাড়ির লোহার ফটকের আগল খুলে অপুর মা ভেতরে পা দিয়ে বলল, “এটা কলকাতা শহর, এখানে কি গলা ছাড়া যায়! তখন বয়স কম ছিল, জোর ছিল কাজেতে, আর সেটা ছিল গ্রাম। তবু মাঝেমধ্যে রেগে গিয়ে গলাটা তখন আর বশে থাকে না, তুলে ফেলি। শুনলে না কামারটার কাছে, মুরারিদা গাঁজায় দুটো টান দিয়েই কী বলেছে।” অপুর মা'র স্বরে অভিমান আর ক্ষোভ ঝরে পড়ল।

গুলতি তৈরি হয়ে গেল

বাড়িতে পা দিয়েই কলাবতী দোতলায় ছুটে গেল লোহার 'ওয়াই'টা দাদুকে দেখাবার জন্য। রাজশেখর তখন বসার ঘরে ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে টিভিতে রোমা আর এভার্টনের মধ্যে দু'দিন আগে খেলা ফুটবল ম্যাচটা ই এস পি এন চ্যানেলে দেখছিলেন। পাশেই মেঝেয় বসে মুরারিও দেখছিল খেলা। কলাবতী তার হাতের জিনিসটা তুলে ধরে বলল, “বলো তো দাদু, এটা কী?”

রাজশেখর ভ্রূ কুঁচকে দেখে বললেন, “তক্তা রাখার ব্র্যাকেট।”

“মোটেই না, এটা দিয়ে তৈরি হবে গুলতি।” কলাবতী ওয়াইটা বাঁ হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ডান হাতে কাল্পনিক তীর ছোড়ার মতো ভঙ্গিতে ছিলে টেনে ধরল। “মালোপাড়ার বস্তির মধ্যে শ্যামা কামারের কামারশাল থেকে তৈরি করালুম। পিসি এবার কাক চিল বেড়াল কুকুর দেখলেই শিক্ষা দিয়ে দেবে। উফ্‌ফ অমন সাধের বড়ির কী দশাটা করল।”

রাজশেখর হাসি চেপে বললেন, “দিদি, এবার যে দুটো এক বিঘত লম্বা রবার লাগবে আর রবার দুটোর মাঝে একটুকরো চামড়া লাগবে, তা না হলে তো গুলতি হবে না।”

“রবার!” কলাবতী চিন্তায় পড়ে গেল, “পিসি অবশ্য রবাটের কথা বলেছিল। কোথায় পাই বলো তো দাদু?”

দাদু-নাতনি খুবই সমস্যায় পড়ে গেল। রাজশেখর বললেন, “আমরা ছেলেবেলায় যেসব গুলতি বিক্রি হতে দেখেছি তার ছিলেগুলো মোটরের চাকার টিউব কেটে বানাত।”

“টিউব পাব কোথায়। যেসব দোকান টায়ার সারায় সেখানে খোঁজ করব। স্কুল যাওয়ার পথে অমন একটা দোকান পড়ে, কাল তা হলে খোঁজ নোব।”

এতক্ষণে মুরারি কথা বলল, “মোটরের টায়ারের মধ্যে গোলপানা যে রবারটা থাকে, যার মধ্যে হাওয়া ভরে, সেটার কথা কি বলছেন কত্তাবাবু?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে টিউব বলে।” রাজশেখর উৎসুক চোখে তাকালেন।

“ছোটবাবু তো অমন একটা গোল রবারের টিউব নিয়ে সাঁতার কাটতে যেত কেলাবে, আপনার মনে আছে কত্তাবাবু?”

“খুব মনে আছে। সাঁতার শেখার জন্য ক্লাবে ভর্তি হয়ে টিউবে চড়ে সারাক্ষণ জলে ভেসে বেড়াত। সাঁতারটা আর শেখা হল না।” রাজশেখর হতাশ এবং বিরক্ত স্বরে বললেন।

“সেই টিউবটা তো একতলায় বাতিল জিনিসের ঘরে এখনও পড়ে রয়েছে, ওটা থেকেই তো গুলতির ছিলে তৈরি করা যায়।”

তিন মিনিটের মধ্যেই মুরারি চুপসে থাকা বড় একটা লাল রঙের টিউব কলাবতীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, “এটা অপুর মাকে দাও, ও কাঁচি দিয়ে কেটে ছিলে বানিয়ে নেবে।” তারপর নিচু গলায় বলল, “কালুদিদি, শ্যামা আমার সম্পর্কে কি কিছু বলল?”

কলাবতী আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ এবং গলার স্বর নিয়ে বলল, “সে কী মুরারিদা, লোকটা তোমার চেনে নাকি? কই, কিছু তো বলল না!”

আশ্বস্ত হয়ে মুরারি বলল, “শ্যামা আমার পাশের গ্রামের ছেলে, মানুষটা খুব ভাল।”

সেই সন্ধ্যাতেই রান্নাঘরে ঢোকার আগে অপুর মা তার তিনটে কাঁচির মধ্যে যেটা বড়, সেটা দিয়ে টিউবটা কেটে দুটো রবারের ছিলে বার করল। ওয়াইয়ের দুটো ঊর্ধ্ববাহুর সঙ্গে বাঁধার জন্য শক্ত টোন সুতো চাই। কলাবতীর ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘর অপুর মা'র। সেখানে আছে পুরনো একটা কাঠের দেরাজ আর আলনা। আর আছে একটা স্টিলের তোরঙ্গ, কলাবতী তার নাম দিয়েছে 'আজব বাক্স'। সেই বাক্সে আছে বাতিল চিরুনি, টুথব্রাশ, ভাঙা ছিটকিনি, নানার মাপের স্ক্রু ও পেরেক, স্ক্রু ড্রাইভার, ঘুড়ির সুতো, উড পেন্সিলের টুকরো, ইরেজার, শাড়ির পাড়, কলাবতীর হোমটাস্কের খাতা যার অর্ধেক পাতা সাদা রয়ে গেছে, নাইলনের দড়ি, বোরিক তুলো, অর্ধেক খাওয়া ওষুধের শিশি, নানান মাপের ও রঙের বোতাম, ব্লেড, হাতলভাঙা হাতুড়ি, ফলকাটা ভোঁতা ছুরি এবং আরও বহুবিধ দ্রব্য। মজার কথা, এইসবের কোনও-না-কোনওটা কখনও-না-কখনও ঠিক দরকার পড়ে যায়, আর তখনই বাক্স থেকে অপুর মা সেটি বার করে দেয়।

গুলতিতে রবারের ছিলে বাঁধার জন্য দরকার শক্ত টোন সুতো, সেটিও বেরোল পিসির আজব বাক্স থেকে। কবে যেন সুতোয় বাঁধা বই দিল্লি থেকে ডাকে এসেছিল সত্যশেখরের জন্য। অপুর মা তখনই সুতোটা তুলে রেখেছিল। তবে পাওয়া গেল না নরম চামড়ার টুকরো।

“দরকার নেই কালুদিদি চামড়ার, গ্রামে আমরা শাড়ির মোটা পাড় দিয়েই চালিয়ে দিয়েছি।”

সুতরাং সমস্যা মিটে গেল।

রাত্রে অপুর মা শোয় কলাবতীর খাটের পাশে মেঝেয় বিছানা পেতে। এই শোয়ার স্থানটি সে নিজেই নির্বাচন করেছে, কারণ 'অতটুকু মেয়ে রাতে একা একা ঘুমোলে খারাপ স্বপন দেখে ভয় পেতে পারে।' স্বপন দেখে ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, তবে প্রায়ই ভোরবেলা দেখা যায় কলাবতী মেঝেয় পিসিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে।

কলাবতী ঘুমিয়ে পড়ার পর অপুর মা তার বিছানায় ছুঁচ সুতো কাঁচি নিয়ে বসে গুলতি তৈরি শেষ করল যখন, বসার ঘরে প্রায় একমানুষ উঁচু গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে তখন রাত বারোটা বাজল। ঘড়িটি রাজশেখর কেনেন চৌরঙ্গি এক্সচেঞ্জ নামে তাঁর চেনা এক নিলাম ঘর থেকে। ফ্রান্সে তৈরি দেড়শো বছরের পুরনো ঘড়িটা তাঁর কথায় 'জলের দামে মাত্র নব্বুই হাজার টাকায় পেয়েছি।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে কলাবতী দেখল তার বালিশের পাশে রয়েছে লোহার গুলতিটা, তাতে রবারের ছিলে বাঁধা। সেটা হাতে নিয়ে দুই আঙুলে দুটো ছিলের মাঝে জোড় দেওয়া কাপড়ের পাড়টা টিপে ধরে রবারটা টেনে ছেড়ে দিল, শব্দ হল 'ছপাং'। দু-তিনবার ছপাং শব্দটা শুনে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে বারান্দায় এসে “পিসি, পিসি” বলে চেঁচাতে শুরু করে দিল। অপুর মা তখন একতলায় ঘর মোছামুছির ঠিকে ঝি কান্তির মা'র দালান মোছার দিকে নজর রাখতে রাখতে তার রান্নাঘরের সহকারী শকুন্তলাকে নির্দেশ দিচ্ছিল, “ফিজ থেকে ডালবাটাগুলো বার করে ভাল করে ফ্যাটা, আজ আবার বড়ি দোব। দেখব আজ কাকের একদিন কি আমার একদিন।”

কলাবতী একতলায় নেমে এসে বলল, “পিসি কখন বানালে গুলতিটা, রাতে? এটা নিয়ে আমি কিন্তু আজ স্কুলে সবাইকে দেখাব।”

“একদম নয়।” অপুর মা কড়া গলায় কলাবতীকে দমিয়ে দিয়ে বলল, “আজ বড়ি দোব, ওটা আমার দরকার।”

“কাকা-শালিক মারবে? কিন্তু কী দিয়ে ছুড়বে গুলতি, সেজন্য

তো সুপুরির মতো ইট কি পাথর চাই!"

"তুমি কি ভেবেছ, সে ব্যবস্থা আমি করিনি? কাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় দেখলুম একটা বাড়ির জন্য ভিত খোঁড়া হয়েছে, আর ইট বালি পাথরকুচি গাদা করে রাখা ফুটপাতের ধারে। মাটি তো নয়, যেন নলেন পাটালি। ওই মাটি পুড়িয়ে খুব শক্ত গুলি হবে। তাই আজ ভোরবেলায় যখন রাস্তার লোকজন প্রায় নেই তখন বালতি নিয়ে আর মোটা প্লাস্টিকের একটা বড় থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।"

"বাড়ির জন্য ভিত খোঁড়া হচ্ছে তো অনেক দূরে, প্রায় পাঁচশো গজ এখান থেকে! তুমি এত দূর থেকে বয়ে আনতে পারলে?"

"কেন পারব না!" অপুর মা অবাক হয়ে বলল, "ভত্তি এক বালতি মাটির ওজন কত? পনেরো-কুড়ি কেজি, আর পেলাসটিকে পাথরকুচির ওজন বড়জোর পাঁচ-সাত কেজি। দু'হাতে এ দুটো বইতে পারব না!" অপুর মা যেভাবে তাকিয়ে রইল তাতে কলাবতীর নিজেকে মনে হল সে গোপাল ভাঁড়ের মতো হাসির কথা বলছে।

কলাবতী কথা বাড়াবার সাহস আজ পেল না। দোতলা থেকে নেমে এল সত্যশেখর, সেরেস্তায় মক্কেল আসার সময় হয়ে গেছে। কলাবতীর হাতে গুলতিটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কালু, তোর হাতে ওটা কী?"

"গুলতি।"

"একটা যাচ্ছেতাই বাজে জিনিস, পেলি কোথা থেকে? জানিস কী বিপজ্জনক ওটা? তোর বড়দি তখন তোর বয়সী, খেলাচ্ছলে ধাঁ করে গুলতিতে ইট লাগিয়ে মেরে আমার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ওয়েপন। মলয়াকে আমি এক মাস ক্ষমা করিনি। আসলে বকদিঘির মেয়ে তো, তোর বাপের মতোই আটঘরাকে সহ্য করতে পারে না।"

"বড়দিকে তা হলে তো জিজ্ঞেস করতে হয় কেন তোমার কপাল ফাটিয়েছিলেন।"

"খবরদার। বড়দির কাছ থেকে আমার সম্পর্কে কোনও ইনফর্মেশন নেওয়ার চেষ্টা করবি না, টপ টু বটম বাজে খবর দেবে।" বলেই সত্যশেখর লম্বা পায়ে সেরেস্তার দিকে হাঁটা দিল।

স্কুলে যাওয়ার সময় কলাবতী দেখল শকুন্তলা পাটি, কাপড় আর ডালবাটা ভর্তি গামলা আর অপুর মা হাতে গুলতি আর পলিথিনের একটা থলি নিয়ে তিনতলায় উঠছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় ফটক দিয়ে ঢুকেই তার চোখ গেল ছাদের পাঁচিলে। অন্তত পঞ্চাশটা কাক সার দিয়ে বসে চিৎকার করে চলেছে। এমন দৃশ্য তাদের বাড়িতে সে আগে কখনও দেখেনি।

সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকতেই দেখা হল মুরারির সঙ্গে। অবাক কলাবতী বলল, "মুরারিদা, ছাদে কী হয়েছে, অত কাক বসে চেঁচাচ্ছে?"

"কাকেরা হরিসংকীর্তন করছে। অপুর মা ওদের দু'জনকে স্বপ্নে পাঠিয়েছে কিনা।"

"গুলতি দিয়ে?"

"তবে না তো কী!"

শুনেই উত্তেজিত কলাবতী ছুটল দোতলায়। অপুর মা তখন রাজশেখরকে চা দিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। "পিসি, তুমি দু-দুটো কাক মেরেছ গুলতি দিয়ে!"

"হুঁ।" গম্ভীর মুখে কলাবতীর পাশ কাটিয়ে অপুর মা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি কাক মারা দেখব পিসি, চলো, ছাদে চলো, গন্ডা গন্ডা কাক বসে আছে। গুলতিটা কোথায়?"

অপুর মা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, "কলকাতার কাক যে এমন বিটকেল হয় তা যদি আগে জানতুম তা হলে কি মারতুম, বাড়ি যেন মাথায় তুলেছে। কত্তাবাবু পর্যন্ত বকলেন আমায়। এখন উনি বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন, সন্ধের আগে ফিরবেন না। আর বাবা আমি ওই গুলতি ধরছি না!"

"কাক দুটোকে কী করলে?"

"পায়ে দড়ি বেঁধে তারে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। অন্যেরা দেখুক বড়ি নষ্ট করলে কেমন শাস্তি পেতে হবে। ওম্মা, তারপরই ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে পাঁচিলে বসে গেল। তবে ছাদে কেউ নামেনি, বড়ির ধারেকাছেও কেউ আসেনি, যাই শকুন্তলাকে বলি, ও দুটোকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে।"

"পিসি, তুমি ক'বার ছুড়লে?"

"দুটো পাথর।" অপুর মা দুটো আঙুল তুলে দেখাল।

"আর তাতেই দুটো কুপোকাত! তোমার হাতে এত টিপ! তাও কত বছর প্র্যাকটিস নেই!"

ভ্রূ কুঁচকে অপুর মা বলল, "কী নেই?"

"প্র্যাকটিস, মানে অনুশীলন।"

অপুর মা কী বুঝল কে জানে, শুধু বলল, "অ। এখন হাতমুখ ধুয়ে এসো, আজ খিদেটিদে আছে তো, না কি কেউ টিপিনের ভাগ দিয়েছে?"

"ভীষণ খিদে পাবে পিসি যদি গুলতিটা আমাকে দিয়ে দাও।"

কলাবতীর সঙ্গে পঞ্চুর সাক্ষাৎ

সেইদিনই অপুর মা গুলতিটা তুলে দিল কলাবতীর হাতে। পরের দিন একটি কাককেও দেখা গেল না ছাদের আশপাশে। বোধ হয় অপুর মা'র শাস্তি দেওয়ার ধরন দেখে তারা বুঝতে পেরেছে বড়ি খাওয়ার সুখ থেকে প্রাণরক্ষা করাটা বেশি জরুরি। এর পর বড়ি দেওয়া, শুকনোর পর প্লাস্টিকের কৌটোয় তুলে রাখার কাজ সাত দিনের মধ্যেই অপুর মা সমাপ্ত করে ফেলল। তারপর বড়ির গুণগত উৎকর্ষ পরীক্ষা করার দিন পোস্ত বড়িভাজা, পলতার শুক্তোবড়ি, হিং দিয়ে ঝালের বড়ি এবং টকের বড়ি রান্না হল এক রবিবারের দুপুরে।

খাওয়ার পর রাজশেখরের মন্তব্য, "শুক্তোটা আর একদিন খাইয়ো, বহু বছর পর আসল বড়ি খেলুম।"

সত্যশেখর অবশ্য খুঁত ধরল, "কালু, পোস্তর বড়িটা তোর কেমন লাগল? একটু ঝাল ঝাল হলে মোহন্তর পকৌড়ি আর মুখে দেওয়া যাবে না।"

কলাবতী বলল, "তেঁতুলের টকে যে বড়ি খেলুম সেটা ধুপুকে খাওয়াতেই হবে পিসি, তুমি একদিন রেঁধে দাও, আমি ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসব।"

এইসব কথা শুনে আত্মপ্রসাদ চেপে নম্রস্বরে অপুর মা বলে, "শুধু টকের বড়ি কেন, অন্য বড়ির রান্নাও টিপিন কেরিতে করে দোব, নিয়ে গিয়ে ধুপুর মাকে খাইয়ে আসবে আর বলে দেবে এসব আটঘরার বড়ি।"

রাজশেখর বললেন, "শুধু ধুপুর মাকে কেন, হরির বাড়িতেও পাঠাব, খেয়ে দেখুক আটঘরার বড়ি কী জিনিস।"

তিনদিন পর স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী শোয়ার ঘরে ঢুকেই দেখল তিন বাটির টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবলের ওপর রাখা। দেখেই সে বুঝে গেল এটাকে নিয়ে তাকে ধুপুদের বাড়ি যেতে হবে। যাওয়ার সম্ভাবনায় সে খুশিই হল। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির বাইরে অনেক কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, হঠাৎ দেখা হয়ে যায় স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। তা ছাড়া পিসি যাকে বলে 'অখাদ্য কুখাদ্য', সেইসব জিনিস কিনে খাওয়া যায়।

আধঘন্টা পর টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে কলাবতী যখন বেরোচ্ছে, অপুর মা তখন হুঁশিয়ারি দিল, "রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটবে, নাচতে নাচতে যেন যেও না, টিপিন কেরিটা নাড়ানাড়ি কোরো না। আর বোলো গরম করে নিয়ে যেন খায়। ফেরত দেওয়ার সময় যেন ভাল করে ধুয়ে দেয়।"

ধুপুদের ফ্ল্যাট প্রায় দশ-বারো মিনিটের পথ। বাসরাস্তা পার হয়ে কিছুটা ভেতরে একটা মাঝারি চওড়া রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গেলে পড়বে একটা পার্ক। সেটার তিনদিকে চার-পাঁচতলার সাত-আটটা ফ্ল্যাটবাড়ি, ফুটপাথে ও পার্কে বড় বড় গাছ। এলাকাটায় নতুন বসত হয়েছে, তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পার্কের যেদিকে বাড়ি নেই সেই

দিকে রেললাইন এবং সার দিয়ে টালির ঘর।

কলাবতী যেতে যেতে দেখল পার্কের ছোট গেটের ধারে ডালমুট, চানাভাজা, সিদ্ধ ছোলা নিয়ে বসে একটি লোক। তার পাশে তোলা উনুনে বালিভরা কড়াইয়ে চিনেবাদাম ভাজছে এক স্ত্রীলোক। গরম বাদাম খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। টিফিন ক্যারিয়ারটা ফুটপাথে রেখে কিনল একশো গ্রাম সদ্য ভাজা বাদাম। ঠোঙাটাকে হাতে নিয়ে একটা বাদাম দু' আঙুলে টিপে দানা বার করে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল, "নুন দাও।"

লোকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের পুরিয়ার মতো কাগজের একটা পুরিয়া তাকে দিল। সেটা খুলে আঙুলের ডগায় নুন লাগিয়ে জিভে দিল। তখন তার চোখে পড়ল গজখানেক দূরে আইসক্রিমওলার পাশে রয়েছে ঝালমুড়িওলা।

কলাবতী বাদামের ঠোঙা হাতে এগোল ঝালমুড়ি কিনতে। "দু' টাকার দাও, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ বেশি করে।"

বাঁ হাতে বাদামের ঠোঙা ডান হাতে ঝালমুড়ির। কলাবতী ঠিক করল, আগে ঝালমুড়িটাকে শেষ করে একটা হাত টিফিন ক্যারিয়ারের জন্য রাখবে। এর পরই সে চমকে উঠে তাকাল, যেখানে টিফিন ক্যারিয়ার ফুটপাথে রেখে বাদাম কিনছিল সেই জায়গাটার দিকে, দেখল একটা বানর টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নিয়ে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে উঠে পার্কের ভেতর নামল। তারপর ছুটে দূরে গিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের মাথার খিলটা সরিয়ে ঢাকনা তুলল। বানরটা বছর দেড়েকের বাচ্চা ছেলের মতো, ল্যাজটা হাতখানেক লম্বা, গায়ের লোমের রং পাট-এর মতো।

বাদামওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "ধরো, ধরো, খুকি দাঁড়িয়ে আছ কেন, দৌড়োও ওর পিছে।"

কলাবতী ধড়মড়িয়ে ছুটে গেল গেটের দিকে। পার্কের মধ্যে ঢুকে "হেই হেই" বলে চিৎকার করতে করতে ছুটল বানরটার দিকে। ওপরের বাটিতে রাখা ছিল আলু ও বেগুন দিয়ে বড়ির ঝাল। বানরটা কপকপ করে সেগুলো তুলে মুখে পুরছে। কলাবতীকে ছুটে আসতে দেখে বানরটা টিফিন ক্যারিয়ার ফেলে পাশেই রাধাচূড়া গাছটায় উঠে মুহূর্তে মগডালে পৌঁছে গেল।

কলাবতী ফ্যালফ্যাল করে মুখ তুলে বানরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটায় ঢাকনা পরাবার আগে প্রথম বাটিতে পড়ে থাকা ঝোলটুকু ফেলে দিল। তবু ভাল, বাকি দুটি বাটি অক্ষত রয়ে গেছে। পার্কে যারা ঘটনাটা দেখেছে তাদের বেশির ভাগই হাসল, দু-তিনজন সহানুভূতি জানাল। লজ্জায় গরম হয়ে গেল কলাবতীর দুটো কান। একটা বানরের কাছে এমন হেনস্থা হতে হল! মজা পেয়ে লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভাবছে, মেয়েটা কী নির্বোধ।

কলাবতী পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই বাদামওলা তাকে বলল, "বানরটা আমার ছোলা, চানা চুরি করে খেত। কেন চুরি করত সেটা আমি বুঝি। মানুষের মতো জানোয়ারেরও খিদে পায়। মানুষ ভিক্ষে করেও পেট চালাতে পারে, কিন্তু জানোয়ার তো ভিক্ষে করতে পারে না, তাই চুরি করে খায়। একদিন আমি ওকে পাকড়াও করে আচ্ছাসে পিটুনি দিয়ে বললুম, চুরি করবি না, এখানে এসে দাঁড়াবি, আমি তোকে চানা দোব। ও এসে দাঁড়াত, আমি একমুঠো চানা দিতাম। কিন্তু ওইটুকু খাবারে কি পেট ভরে? তাই ও চুরি করে খায়। খুকি তুমি কিছু মনে কোরো না, ওকে মাফ করে দাও।"

পার্কের ধারেই চারতলা একটা বাড়ির দোতলায় ধুপুদের ফ্ল্যাট। তাকে দেখে ধুপু অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে বলল, "তুই! কী ব্যাপার, হাতে ওটা কী?"

"বড়ি।"

এর পর কলাবতী তার আগমনের কারণ জানিয়ে দিতে ধুপু বলল, "মা তো বড়মাসির বাড়ি গেছে, সন্ধের পর আসবে। যাই হোক, ওগুলো আমি রেখে দিচ্ছি, রাতে সবাই খাব।" ধুপু টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনাটা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এটা যে একদম খালি!"

কলাবতী অপ্রতিভ হেসে বলল, "আর বলিস কেন, ওটায় ছিল বড়ির ঝাল, একটা বানর খেয়ে নিল।"

তারপর সে ধুপুকে বলল ফুটপাথ থেকে টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নিয়ে বানরের পালানো এবং পার্কের মধ্যে বসে তার বড়ি খাওয়ার ঘটনাটা। শুনেই ধুপু হো হো করে হেসে উঠে বলল, "পঞ্চু তোকেও তা হলে ঘোল খাইয়েছে!"

"এটা ঘোল খাওয়ানো নয়, চুরি।"

"এখানে খুব কম বাড়িই আছে যেখানে পঞ্চু রান্নাঘরে ঢোকেনি বা চুরি করে খায়নি, তবে জিনিসপত্তর ভাঙে না, কাপড়চোপড় ছেঁড়ে না, রেললাইনের ধারে থাকত উসমান বানরওয়ালা, তার ছিল তিনটে বানর, তাদের দিয়ে রাস্তায় খেলা দেখিয়ে সে পেট চালাত। অদ্ভুত ট্রেনিং দিয়েছিল বানরগুলোকে। একেবারে মানুষের মতো আচরণ করত! পঞ্চু ছিল তিনটের একটা, মানেকা গাঁধী কী যেন আইন করলেন, কেউ খাঁচায় পশুপাখি আটকে রেখে তাদের কষ্ট দিতে পারবে না, তাদের দিয়ে খেলা দেখাতে পারবে না। ব্যস, একদিন উসমানকে বানর সমেত পুলিশে থানায় ধরে নিয়ে গেল, পঞ্চুটা থানা থেকে পালাল। উসমানকে অবশ্য পুলিশ ছেড়ে দেয়। বাকি বানর দুটোকে পুলিশ সল্টলেকে বন দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে বলে শুনেছি। উসমান তারপর দিনমজুরের কাজ নিল। এদিকে পঞ্চু ঠিক ফিরে এসেছে। রাতে উসমানের কাছেই থাকে, খায়ও ওর সঙ্গে, দিনের বেলা থাকে পার্কের কাছে। তার মধ্যেই কখনও লোকের বাড়িতে ঢুকে রেন ওয়াটারপাইপ বেয়ে তিন কি চার তলায় উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে বারান্দায় নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কোন বাড়িতে ঢুকেছে সেটা জানতে পারি যখন 'ধর ধর, তাড়া ওটাকে তাড়া' বলে একটা চেঁচামেচি শুরু হয়।" বলতে বলতে ধুপুর হাসি দেখে কলাবতী বুঝল, পঞ্চু নামক বজ্জাতটি ওর খুবই স্নেহের পাত্র।

"উসমান কি ওকে খেতে দেয় না?"

শুনেই ম্লান হয়ে গেল ধুপুর মুখ। বলল, "উসমান মরে গেছে। ইট ভর্তি লরির ওপর বসে দমদম যাচ্ছিল, লরিটা এক গর্তে পড়ে উলটে যায় আর উসমান ইটের নীচে চাপা পড়ে, হাসপাতালে দু'দিন বেঁচে ছিল। তারপর থেকে পঞ্চু অনাথ। আমাদের পেছনের পাড়ার এক হাউজিংয়ের দরোয়ান ওকে পোষার চেষ্টা করেছিল। গলায় বকলস পরিয়ে চেন দিয়ে বাড়ির গেটে বেঁধে রেখে দিত কিন্তু পঞ্চু দু'বেলা খাওয়া পাওয়ার জন্য বাঁধা থাকতে চায়নি। পাঁচদিনের দিনই চেন খুলে পালিয়ে যায়।"

"পঞ্চু নামটা কার দেওয়া, উসমানের?"

"আরে না, না, নামটা ওই শিবনাথ বাদামওয়ালার দেওয়া। পুরো নাম পঞ্চানন। তার মানে শিব, মহাদেব।"

"মহাদেবই বটে! তোর পঞ্চুকে বাগে পেলে গুলতি মেরে ওর মাথা ফাটাব।"

"খবরদার কালু, ওই কাজটি করতে যাস না। পঞ্চু অসম্ভব ভাল নকল করতে পারে। যা একবার দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে কপি করে নেবে, তারপর করে দেখাবে। মাথা হয়তো তুই ওর ফাটাবি কিন্তু একদিন তোরই মাথা ফাটাবে ওই গুলতি দিয়েই। মা একদিন হাতা দিয়ে রান্নাঘরে ওর মাথায় ঠকাস করে মেরেছিল, দু'দিন পর সকালে মা ওমলেট করছে তখন কে যেন মাথায় খুট করে মারল। চমকে মা ফিরে দেখে পঞ্চু রান্নাঘরের টুলের ওপর। হাতে সেই হাতাটা আর কিচকিচ, কিচকিচ করে হাসছে। এখনও আমরা ওটা নিয়ে হাসাহাসি করি। এক মিনিট বোস, টিফিন ক্যারিয়ারটা খালি করে দিচ্ছি, তোর পিসি হঠাৎ বড়ির রান্না করে পাঠালেন যে?"

"সেদিন টিফিনে তুই বড়ি খাওয়ালি, এটা তার রিটার্ন। কাল স্কুলে অবশ্যই বলবি খেয়ে কেমন লাগল।"

ধুপুর কাছ থেকে ফেরার সময় কলাবতী দেখল, ঝালমুড়িওয়ালা তখনও রয়েছে। পঞ্চুকে তাড়া করতে গিয়ে হাতের বাদাম ও ঝালমুড়ির ঠোঙা প্রথমেই বিসর্জন দিতে হয়েছিল। আবার সে দাঁড়িয়ে বিসর্জিত ঠোঙাটা উদ্ধারের চেষ্টায় রিপিট করল, "দু' টাকার দাও, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ বেশি করে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঠোঙা হাতে নিয়েই কলাবতী দেখল ঝালমুড়িওয়ালার পেছনে পার্কের রেলিংয়ের ওপর বসে পঞ্চু। কোথা থেকে কখন যে এল কে জানে! ওকে দেখে মায়া হল কলাবতীর। পঞ্চুকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবার চেষ্টা করে সে কষ্ট পেল।

একগাল মুড়ি মুখে দিয়ে ঠোঙাটা সামনে বাড়িয়ে সে বলল, "আয় পঞ্চু।"

শোনামাত্র পঞ্চু রেলিং থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে ঠোঙাটা কলাবতীর হাত থেকে তুলে নিয়ে যেভাবে সে মুখে মুড়ি ঢেলেছিল হুবহু সেইভাবে পঞ্চু মুখে ঢেলে ঠোঙাটা শেষ করে দিল। কলাবতী বুঝল ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। আইসক্রিমওয়ালা চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চুর মুড়ি খাওয়া দেখতে। কলাবতী তার কাছ থেকে একটা কাপ কিনল। কাঠের চামচ দিয়ে খানিকটা আইসক্রিম মুখে তুলে সে-কাপটা পঞ্চুর দিকে বাড়িয়ে দিল। তার নকল করে চামচ দিয়ে তুলে তুলে কেমন করে খায় কেমন করে সেটা দেখবে। চামচ নয় জিভ দিয়ে তিন-চারবার চেটেই সে কাপটা পরিষ্কার করে ফেলল। কলাবতী হেসে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে তুলে নিয়ে এগোতেই তার জিনসের হিপ পকেটে টান পড়ল। এবার তার আরও অবাক হওয়ার পালা। তার টাকা রাখার ব্যাগটা পঞ্চুর হাতে!

বাদামওয়ালা শিবনাথকে হাসতে দেখে কলাবতী আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী?"

"পঞ্চু ছোলা খাওয়াতে বলছে। ও জানে ছোলা কেনার পয়সা ব্যাগে থাকে, তাই ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলছে কিনে দাও।" শিবনাথ একটা ঠোঙায় দু'মুঠো সিদ্ধ ছোলা ভরে কলাবতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "পঁচাশ পয়সা।"

পঞ্চুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে কলাবতী বলল, "ছোলা বিক্রি করিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে কমিশন দিও।"

ঠোঙাটা পঞ্চুর হাতে দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে কলাবতী হাঁটা শুরু করল। একটু গিয়েই রাস্তা পার হওয়ার জন্য সে দু'দিকে তাকাল। দেখল পঞ্চু চার হাত-পায়ে ছুটে আসছে লেজটা 'ং'-এর মতো বাঁকানো, তার পাশে এসে পঞ্চু মাড়ি বার করে দাঁতগুলো দেখিয়ে 'কিচকিচ' শব্দ করে দু-তিনবার কিছু একটা বলতে চাইল। ওর ভাষা বোঝার সাধ্য নেই কলাবতীর, তবু কিছু একটা ধরে নিয়ে বলল, "রাস্তা পার হবি? আঙুল ধর।" সে বাঁ হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে ধরল, একটা বাচ্চা ছেলের মতো পঞ্চু আঙুলটা আঁকড়ে ধরে দুলতে-দুলতে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথে উঠে দু'পা এগোতে না এগোতেই কিচকিচ করে ডেকে ভয়ে কলাবতীর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। সামনে দিয়ে আসছেন এক প্রৌঢ়, তাঁর হাতে ধরা চেনে বাঁধা এক ডোবারমান।

কলাবতী এর আগে কুকুরের সঙ্গে বানরের বা ছাগলের সঙ্গে বানরের খেলা রাস্তায় দেখেছে। কুকুরে-বানরে ভাব হয় বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু এই ডোবারমানটার সঙ্গে পঞ্চুর যে ভাব হয়নি সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কুকুরটা কামড়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় চটপট সে পঞ্চুকে বগল ধরে কোলে তুলে নিল, যেভাবে ছোট ভাইকে কাঁখে নেয় দিদিরা, সেইভাবে।

প্রৌঢ় লোকটি কৌতুকভরে কোলে ওঠা বানরটির এবং কলাবতীর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। খুবই শিক্ষিত ডোবারমান তাই পঞ্চুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু চাপা 'গর্‌র্‌র্‌র' ছাড়া একটা 'ঘেউ' পর্যন্ত করল না। পঞ্চু কলাবতীকে জড়িয়ে মুখ পেছন দিকে ফিরিয়ে যতক্ষণ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যম দেখার মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

পঞ্চুর নতুন আশ্রয়

পঞ্চুকে কোলে করে কলাবতী বাড়িতে ঢুকল। একতলায় কেউ

নেই, দোতলায় এসে দেখল রাজশেখর টেলিফোনে কথা বলছেন। কলাবতীকে দেখে অবাক হয়ে রিসিভারে দুটো কথা বলে সেটা নামিয়ে রাখলেন।

"একে কোথায় পেলি?" রাজশেখরের এটাই প্রথম প্রতিক্রিয়া।

"বলছি।" পঞ্চুকে কোল থেকে মেঝেয় নামিয়ে দিতেই সে কলাবতীর পা আঁকড়ে ভীত চোখে এধার-ওধার তাকাতে লাগল। ওকে পাশে নিয়ে কলাবতী সোফায় বসল।

"এর নাম পঞ্চু, পঞ্চানন। এর কেউ নেই, পার্কের একটা গাছে থাকে আর বাড়ি বাড়ি ঢুকে চুরি করে খায়। আমার টিফিন ক্যারিয়ারটা চুরি করে দৌড় লাগায়।আমি ওকে ধরার আগেই প্রথম বাটির আলু বড়ি বেগুনের ঝালটা ওর গব্বায় চলে যায়। তারপর ধুপুর কাছে শুনলুম পঞ্চু ছিল বানর-খেলানো উসমান নামে একজনের কাছে। ও কিন্তু খুব ট্রেইন্ড।"

রাজশেখর বললেন, "ট্রেইন্ড যে, সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছি, কীরকম চুপচাপ ভদ্দরলোকের মতো বসে রয়েছে! তা একে বাড়ি আনলি কেন?"

কলাবতী বলল, "দ্যাখো দাদু, চুরির জন্য পঞ্চুর তো আমার হাতে মার খাওয়ার কথা। কিন্তু, যেই ওকে মুড়ি খেতে ডাকলুম অমনই কাছে চলে এল, আসলে খাবার দেখে ও ভয় ভুলে গেল। তারপর আইসক্রিম খাওয়ালুম, তারপর ছোলাও। আমি চলে আসছি, ও আমার পিছু নিল। একটা ডোবারমান দেখে পালাবার পথ না পেয়ে ও আমাকে আঁকড়ে ধরল, আমিও ওকে কোলে তুলে নিলুম।"

"দাদু তুমিই তো বলেছিলে, একটা মানুষ ভাল না খারাপ সেটা বোঝা যায় পশুপাখিরা মানুষটাকে কীভাবে গ্রহণ করছে, তাই দেখে। পঞ্চু আমাকে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করেছে। আমি যে সত্যি-সত্যিই ভাল, এর থেকে বড় প্রমাণ আমার কাছে আর কী হতে পারে।"

রাজশেখরের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "এখন তোর নিজেকে কেমন লাগছে?"

কলাবতী পঞ্চুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দারুণ লাগছে। এত ভাল আগে কখনও লাগেনি। পঞ্চু কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকবে।" আবদারে কলাবতীর স্বর নাকি হয়ে গেল।

"তা নয় রইল, কিন্তু বাড়ির অন্যরা, তোর কাকা, পিসি, মুরারিদা, তারা পঞ্চুকে মেনে নেবে তো?"

তখনই বসার ঘরে ঢুকল অপুর মা, কলাবতী যে সোফায় বসে ছিল তার পেছন দিকের দরজা দিয়ে।

"দিয়ে এলে কালুদিদি?"

কলাবতী মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, বলল, "দিয়ে এসেছি, তবে ওরা খাবে রাত্তিরে। কাল স্কুলে ধুপু আমাকে জানাবে কেমন লাগল।"

"মনে করে কিন্তু জেনে আসবে।" অপুর মা তারপর রাজশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, "সকালে বললেন গা গরম গরম লাগছে। থারমিটারটা এনেছি, দেখুন একবার জ্বরটর হল কি না।"

অপুর মা সোফার পেছন থেকে এগিয়ে গেল থার্মোমিটার হাতে, আর তখনই সোফায় গুটিশুটি হয়ে বসা পঞ্চুকে দেখতে পেয়ে তার চোখ দুটো গোল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে সে বলল, "ওম্মা, এ আবার কে?"

জবাব দিলেন রাজশেখর, "পঞ্চু। আজ থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবে। তোমার তাতে অসুবিধে হবে না তো?"

অপুর মা কিছু বলার আগেই কলাবতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, পিসির অসুবিধে হবে কেন, পিসি তো পশুপাখি খুব ভালবাসে, তাই না? তুমি তো দেশের বাড়িতে কুকুর পুষেছিলে, তোমাদের হাঁস ছিল, গোরু ছিল, ছাগলও ছিল।"

অপুর মা বুঝে গেল দাদু-নাতনি জোট এই বানরটার দিকে, দু'জনের বিরুদ্ধে সে একা। তার আপত্তি টিকবে না। থমথমে মুখে সে বলল, "অসুবিধে হবে কেন, একটা বানরের বদলে নয় দুটোকে এবার থেকে দেখতে হবে।" বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজশেখর বললেন, "কালু, ভীষণ চটে গেছে পিসি, তোকে বানর বলে গেল।"

"পিসিকে ঠিক করতে হয় কী করে, আমি জানি। কাল ওকে ধুপুর মায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এমন শুনিয়ে দেব আর বলব তোমার বড়ির ঝাল পঞ্চু চেটেপুটে খেয়েছে। কী রে পঞ্চু, দারুণ নয়?"

কলাবতী পঞ্চুর মাথা ধরে নাড়িয়ে দিল। পঞ্চু 'চিঁইই, চিঁই' শব্দ করে সম্ভবত বুঝিয়ে দিল কলাবতী ঠিকই বলেছে।

রাজশেখর বললেন, "কালু রাতে ও থাকবে কোথায়? শুনলুম তো রাতে পার্কের গাছে থাকত। আমাদের বাগানে তো বড় গাছ বলতে দেবদারু, চাঁপা, নিমগাছ, তার একটাতেই ও থাকুক।"

"না, না দাদু, গাছেটাছে নয়, বাড়ির মধ্যে থাকবে।" কলাবতী আপত্তি জানাল, "আমার ঘরেই থাকবে।"

"তোর ঘরে?" রাজশেখর সন্ত্রস্ত হলেন, "অপুর মা তা হলে বাক্স বিছানা নিয়ে সোজা আটঘরায় ফিরে যাবে। পঞ্চুকে বরং তিনতলার সিঁড়িঘরে চট পেতে বিছানা করে দে। রাতে ওখানে থাকবে আর দিনের বেলা বাগানে।"

মুরারি এতক্ষণ বাড়ি ছিল না। রাজশেখর তাকে পাঠিয়েছেন তার কলেজ সহপাঠী এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা একটি ইংরেজি বই আনার জন্য। মুরারি বই হাতে ফটক দিয়ে ঢুকে দেখল বাগানে কলাবতী চারতলা সমান চাঁপাগাছটার দিকে মুখ তুলে চেঁচাচ্ছে, "ওঠ, ওঠ, আরও ওপরে ওঠ।" ওর হাতে গুলতি।

বিকেলে সে গুলতি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছে বাগানে। অপুর মা কয়লার উনুনে মাটি পুড়িয়ে সুপুরির মাপের গুলি বানিয়ে দিয়েছে, বাগানের পাঁচিলে ইট ঘষে লাল টার্গেট করে সে গুলতি দিয়ে গুলি ছোড়ে বিকেলে। মুরারি গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকে বলছ কালুদি?"

"পঞ্চুকে।" মুরারির বিভ্রান্ত চোখ দেখে সে ব্যাপারটা খোলসা করে দিল, "একটা বানর, আমার সঙ্গে এসেছে, এ বাড়িতেই থাকবে।"

তখনই পঞ্চু লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। মুরারি বানর পছন্দ করে। সে হাত বাড়িয়ে ডাকল, "আয়, আয়।" ডাক শুনে পঞ্চু পিছিয়ে কলাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে পিটপিট করে মুরারিকে দেখতে লাগল। ভাবখানা, এই লোকটার কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি? কলাবতী পঞ্চুকে কোলে তুলে মুরারির কাছে এসে বলল, "এ হচ্ছে মুরারিদা, ভয় করবি না, খুব ভাল লোক।" পঞ্চুকে সে মুরারির কোলে তুলে দিল। কোলে উঠেই সে মুরারির ঝোপের মতো সাদা চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে উকুন খুঁজতে শুরু করল। বিব্রত কলাবতী বলল, "আরে আরে,করছে কী!"

"ও কিছু না কালুদি, এটা বানরের স্বভাব। তবে উকুন একটাও পাবে না।"

"না পাক, কালই তুমি চুল ছোট ছোট করে কেটে আসবে।"

তারপর মুরারির হাতে বই দেখে কলাবতী বলল, "ওটা তো দাদুকে দেবে? আমায় দাও।"

বইটা নিয়ে সে পঞ্চুকে মুরারির কোল থেকে নামিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল, "যা, দাদুকে দিয়ে আয়।" পঞ্চু পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। কলাবতীর মনে হল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

"ঠিক আছে চল, দাদুকে চিনিয়ে দিচ্ছি। মুরারিদা, পঞ্চু ট্রেনিং পাওয়া বানর। ওর মালিক ওকে হুকুম বলো আর নির্দেশই বলো তামিল করার শিক্ষাটা দিয়েছে, নয়তো রাস্তায় অত লোকের সামনে খেলা দেখাতে পারত না।" এক হাতের বগলে বই, অন্য হাতে কলাবতীর আঙুল ধরে পঞ্চু হাঁটছে।

মুরারি বলল, "পঞ্চু কি তা হলে বানর-খেলানোওলার বানর ছিল? তুমি পেলে কী করে?"

"পরে সব বলব। এখন থেকে ওকে নতুন করে ট্রেনিং দোব, অন্যরকমের।"

পঞ্চুকে হাত ধরে কলাবতী দোতলায় নিয়ে এল। রাজশেখর

তখন লাইব্রেরি ঘরের টেবলে একটা ম্যাপের বই খুলে চশমা চোখে ঝুঁকে দেখছিলেন।

কলাবতী দরজায় দাঁড়িয়ে পঞ্চুর কানে ফিসফিস করে বলল, "ওই হচ্ছে দাদু, বইটা দিয়ে আয়।" এই বলে সে পঞ্চুর ঘাড়ে একটা ঠেলা দিল। পঞ্চু চোখ তুলে তাকিয়ে বারকয়েক পিটপিট করে ঢুকল ঘরের মধ্যে, দুলে দুলে রাজশেখরের পাশে পৌঁছল নিঃশব্দে, তারপর 'চিঁ চিঁ' আওয়াজ করল মুখে। চমকে রাজশেখর তাকালেন এবং তাজ্জব বনে গেলেন।

"আরে, আরে, এ কী কাণ্ড!" বইটা হাতে নিয়ে তিনি নাতনিকে বললেন, "তুই শিখিয়েছিস নাকি?"

"তবে না তো কে শেখাবে? আস্তে-আস্তে ওকে আরও শেখাব।"

জলখাবার উধাও

সত্যশেখর হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে, সেখানেই কয়েকশো উকিল অ্যাটর্নি বসেন এমন একটা বাড়িতে তার ছোট্ট চেম্বারে মক্কেলদের সঙ্গে কথাটথা বলে বাড়িতে ফিরল সন্ধের পর। স্নান করে জলযোগ সেরে এবার সে মক্কেলদের নিয়ে বসবে বাড়ির চেম্বারে, যাকে সে পুরনো ঢঙে বলে সেরেস্তা।

ক্ষুদিরামবাবু পড়াতে এসেছেন। পড়ার ঘরে আসবার আগে কলাবতী পঞ্চুকে তিনতলার সিঁড়িঘরে রেখে দোতলায় সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল গেট বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে একতলা-দোতলা ঘুরে বেড়াতে না পারে। সত্যশেখর সেরেস্তায় বসেই মুরারির এনে দেওয়া জলখাবার খায়। এখন মক্কেল কেউ এলে বাইরে রাখা চেয়ারে অপেক্ষা করে।

চারখানা গরম পরোটা, আলু ছেঁচকি ও দুটি ল্যাংচা মুরারি রেখে দিল টেব্‌লে। সত্যশেখর তখন মামলার একটা ব্রিফ পড়ছিল। মুখ তুলে প্লেটের দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "একটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে যাও, বাইরে কি কেউ এসেছে?"

"আসেনি।" বলে মুরারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই লঙ্কা নিয়ে এসে বলল, "ওপরে ফোন এসেছে।"

টেব্‌লে রাখা ফোনটার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে সত্যশেখর বলল, "সাতদিন হয়ে গেল এখনও লাইন ঠিক হল না। কোথা থেকে ফোন এসেছে?"

"কত্তাবাবু বললেন শিলিগুড়ি থেকে।"

"ওহ্‌হ্‌," সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে দোতলায় ফোন ধরতে গেল। মুরারিও ঘর থেকে বেরোল।

মিনিটপাঁচেক পর সত্যশেখর ফিরে এসে খাবারের প্লেটটা টেনে এনে তাকাতেই চক্ষুস্থির, তারপরই চিৎকার, "মুরারি, মুরারি। দুটো মাত্র পরোটা আর ল্যাংচা দুটো গেল কোথায়?"

ত্রস্ত মুরারি ছুটে এসে প্লেট দেখে বলল, "আমি তো চারটেই দিয়েছি আর দুটো ল্যাংচাও।"

হুঙ্কার দিয়ে সত্যশেখর বলল, "তা হলে গেল কোথায়। কেউ একজন নিশ্চয় নিয়ে গেছে। কে সে? ভূত নিশ্চয় নয়!"

অঙ্ক কষতে কষতে কলাবতীর কানে গেছে কাকার কণ্ঠস্বর, সে ক্ষুদিরামবাবুকে "আমি আসছি সার, এক মিনিট" বলেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দোতলায় সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল গেট খুলে তিনতলায় সিঁড়িঘরে পৌঁছে দেখল পঞ্চু নেই এবং ছাদের দরজা খোলা। মনে মনে সে বলল, "যা ভেবেছিলুম, নিশ্চয় পঞ্চুর কাজ।"

আলো জ্বেলে সে ছাদের এধার-ওধার দেখতে শুরু করল। হঠাৎ দেবদারু গাছে সরসর শব্দ হতেই সে পাঁচিলের ধারে এসে নিচু গলায় ডাকল, "পঞ্চু, পঞ্চু, অ্যাই পঞ্চু।" গাছ থেকে চিঁচিঁমতো একটা আওয়াজ হল।

দেবদারু গাছটা বাড়ির গা ঘেঁষে। তার ডালপালা ছাদ থেকে হাতদশেক দূরে। কলাবতী আবার ডাকল, "আয়, আয়।" গাছ থেকে লাফ দিয়ে ঝপাত করে ছাদের পাঁচিলে নামল পঞ্চু। কলাবতী ওর হাতের চেটোয় হাত দিয়ে পেল চটচটে রস। বুঝে গেল কাকার প্লেটের ল্যাংচার ও পরোটার অন্তর্ধান রহস্যটা। এখন কাকা যদি জানতে পারে বাড়িতে একটা বানর পোষা হয়েছে, আর সেই বানর তার খাবার চুরি করেছে, তা হলে যা কাণ্ড ঘটবে, সেটা ভেবে সে মনে মনে শিউরে উঠল।

ছাদের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে আবার সিঁড়িঘরে পঞ্চুকে রেখে কলাবতী দোতলার কোলাপসিব্‌ল গেট টেনে দিয়ে নীচে নেমে এল পড়ার ঘরে। শুনতে পেল কাকা গজগজ করে চলেছে, "দু-দুটো পরোটা আর ল্যাংচা আমার টেবল থেকে...মুরারি ব্যাপার কী? তোমার তো চুরি করে খাওয়ার অভ্যেস নেই, তা হলে কি কালু? কিন্তু কালু তো খুব একটা মিষ্টির ভক্ত নয়, তা হলে? বাইরের লোক তো কেউ আসেনি, তা হলে? এখন কি আমায় ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতে হবে?"

সারা বাড়িতে ফিসফাস, হুমহুমে ভাব। অপুর মা জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বারবার বলল, "বাবা তারকনাথ, তুমি তো ভূতনাথও, আমাদের দেখো।" মুরারি বলল, "ছি ছি, ছোটকত্তা শেষে আমাকেও বললেন 'তোমার তো চুরি করে খাওয়ার ওব্যেস নেই', তার মানে ওনার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, নইলে কথাটা বলবেন কেন?" রাজশেখর বললেন, "হয়তো অপুর মা দুটো পরোটাই দিয়েছিল আর ল্যাংচা দিতে ভুলে গেছল। মুরারি তো দেওয়ার সময় অতটা নজর করেনি।" প্রতিবাদ করে সত্যশেখর বলল, "না বাবা, আমি ঠিক নজর করেছি, চারটে আর দুটো ছিল।" তিনি আর কথা বাড়াননি, কেননা খাবারদাবারের দিকে ছেলের নজরে যে ভুল হবে না সেটা ভাল করেই জানেন।

রাত্রে খাওয়ার পর দোতলার ছাদে রাজশেখর পায়চারি করছিলেন, তখন কলাবতী তাঁকে বলল, "দাদু, আমি কিন্তু জানি কে খেয়েছে।"

রাজশেখর থমকে দাঁড়ালেন, "কে?"

"কাউকে বলবে না, বলো।"

"বলব না।"

"ওটা পঞ্চুর কীর্তি।"

"কী করে খেল । ও তো সিঁড়িঘরে ছিল!"

"ছিল, সেখান থেকে ছাদ, তারপর লাফিয়ে দেবদারু গাছ, তারপর মাটিতে নেমে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই কাকার ফাঁকা সেরেস্তায় পরোটা-ল্যাংচা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। ভেবেছিলুম ওকে পেটাব, কিন্তু তা হলে তো বাড়ির সবাই জেনে যাবে, পঞ্চুকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে কাকা।"

চিন্তিত স্বরে রাজশেখর বললেন, "এখন থেকে ওকে সামলে রাখতে হবে।"

সামলে রাখার জন্য পরদিন থেকেই সত্যশেখর কোর্টে বেরনোর আগে পর্যন্ত সে পঞ্চুকে নিজের ঘরে বাইরে থেকে দরজাবন্ধ করে আটকে রেখে নীচে পড়তে যেত। তার স্কুলের নমিতাদি সকালে একঘণ্টা সপ্তাহে তিনদিন ইংরেজি আর বাংলা, বাকি তিনদিন অন্য এক স্কুলের শিক্ষক তাকে বিজ্ঞান পড়ান। সত্যশেখরের গাড়ি ফটক থেকে বেরোলেই কলাবতী পঞ্চুকে বাগানে রেখে সদর দরজা বন্ধ করে দেয়। বাড়িতে ঢোকার এই একটিই দরজা। ঢুকতে হলে এবার পঞ্চুকে গাছ বেয়ে উঠে লাফিয়ে ছাদে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। ছাদের দরজাটাও এখন সারাক্ষণ বন্ধ রাখা হচ্ছে। কেউ বাড়ির বাইরে গেলে সদর দরজায় সঙ্গে সঙ্গে খিল পড়ে যায়। পঞ্চু সারা দুপুর বাধ্য হয়েই বাগানে কাটায়। একবার সে পাইপ বেয়ে দোতলার ছাদে উঠেছিল। অপুর মা দেখতে পেরে ছড়ি নিয়ে তেড়ে যেতেই দ্রুত নেমে যায়।

পঞ্চুর আনন্দ উথলে ওঠে যখন কলাবতী স্কুল থেকে ফেরে। ও ঠিক জানে কখন কলাবতী ফটক দিয়ে ঢুকেই "পনচুউ" বলে ডাকবে। ডাক শুনে ছুটে এলেই কলাবতী তাকে কোলে তুলে নেবে। বইয়ের বস্তাটা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বলবে "যা, রেখে আয়।" পঞ্চু দোতলায় রেখে আসবে কলাবতীর টেব্‌লে, আর সঙ্গে করে আনবে গুলতিটা, গুলি রাখা থালিটাও। সবকিছু যেন ওর মুখস্থ। এর পর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আর আলাদা দেখা যাবে না। বাগানে গুলতি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময় দেওয়ালে লাগা পোড়া মাটির গুলি ছিটকে যায়, পঞ্চু সেগুলো কুড়িয়ে এনে হাতে তুলে দেয়।

একদিন দুপুরে দমকা হাওয়ায় ছাদ থেকে রাজশেখরের গেঞ্জি উড়ে গিয়ে পড়ে নিমগাছের উঁচু ডালে। স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী দেখে মুরারি একটা বাঁশ দিয়ে গেঞ্জিটা পাড়ার চেষ্টা করছে। বাঁশটা ছোট তাই পৌঁছচ্ছে না। কলাবতী কিছুক্ষণ দেখে বলল, "থাক মুরারিদা, আমি ব্যবস্থা করছি। পঞ্চু আয় তো।" এর পর সে আঙুল দিয়ে গাছের ডালে আটকে থাকা গেঞ্জিটা দেখিয়ে বলল, "ওটা পেড়ে আন", চটপট দু'মিনিটের মধ্যে গেঞ্জিটা কলাবতীর হাতে পৌঁছে গেল। হাততালির শব্দে সে ঘুরে তাকাল দোতলার ছাদের দিকে। দাদু হাততালি দিচ্ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে পিসি।

রাজশেখর চেঁচিয়ে বললেন, "কালু, ওকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত। চকোলেট কিনে দে, মুরারিকে বল।"

কলাবতীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে মুরারি প্রায় ছুটে গিয়ে 'ক্যাডবেরি' কিনে আনল, কলাবতী মোড়ক ছিঁড়ে চকোলেট পঞ্চুর মুখের সামনে ধরল। জীবনে সে এমন বস্তু মুখে দেয়নি। দু-তিনবার শুঁকেই চকোলেটটা ছিনিয়ে নিয়ে সে মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল। তারপরই সে ছেঁড়া মোড়কটা তুলে নিয়ে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে "চিঁ চিঁ" করে বায়না শুরু করল, তার আরও চাই। কলাবতী ধমক দিল, "আর খায় না, অনেক দাম।"

আটঘরার বড়ি বকদিঘির আচার

খাওয়ার টেব্‌লে রাজশেখর বললেন, "হরি তো গত বছর বকদিঘির আচার পাঠিয়েছিল, আমরা তো এবার আটঘরার বড়ি পাঠাতে পারি, কী বলিস কালু?"

শুনেই কলাবতী লাফিয়ে উঠল, "ঠিক বলেছ দাদু, অনেকদিন বড়দির বাড়ি যাওয়া হয়নি। আমি তা হলে বড়ি নিয়ে যাব।"

সত্যশেখর বিরক্ত মুখে বলল, "আবার ওদের বড়ি দেওয়া কেন. ওই থার্ড ক্লাস আচার খেয়ে আমি এক হপ্তা অন্য কোনও খাবারের টেস্টই ফিল করিনি।"

"কী বলছ কাকা, আদা আর করমচা দিয়ে আচারটা? কী দারুণ খেতে, গোটা শিশি তো আমি আর দাদু সাতদিনে শেষ করলুম। বড়দি যা সুন্দর বানায়!"

"নিজে বানিয়েছে না ছাই, দেখগে মানিকতলায় পল্লী শিল্পাশ্রম থেকে কিনে এনে নিজের হাতে করা বলে চালিয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমি বড়দিকে জিজ্ঞেস করব?"

সন্ত্রস্ত হয়ে সত্যশেখর বলল, "কী জিজ্ঞেস করবি, নিজের হাতে বানিয়েছে কিনা? ও কী বলবে শিল্পাশ্রমের আচার?"

"বড়দি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।" কলাবতী তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। সত্যশেখর বাবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তিনি নাতনির কথা অনুমোদন করে মাথা নোয়ালেন।

১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে যে ব্যবস্থা বাংলায় ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে চালু করেন তাতে জমিদাররা জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পান। সেই সময়ই আটঘরায় সিংহ এবং বকদিঘিতে মুখুজ্জে পরিবার জমিদার হয়ে বসেন আর তখন থেকেই এই দুই পরিবারের মধ্যে জমির দখল ও প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার নিয়ে লাঠালাঠি থেকে বন্দুকের লড়াই পর্যন্ত হয়ে গেছে।

এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি ও লড়াই ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকে, যখন দুই পরিবারই কলকাতায় বাড়ি তৈরি করে গ্রাম থেকে এসে বাস করতে থাকে। সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ। সিংহি আর মুখুজ্জে বাড়ির দুই ছেলে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয় এবং বলা যায় তখন থেকেই পরিবার দুটিতে অন্য ধরনের হাওয়া বইতে শুরু করে। পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সখ্য তৈরি হয়। দুই বাড়িতে শুরু হয় যাতায়াত। তবু কিন্তু দুশো বছরের ঝগড়ার রেশ মাঝেমধ্যে ফুটে

বেরোয় হুল ফুটিয়ে কথা বলার মধ্যে।

চারটে ছোট ছোট পলিপ্যাক হাতে কলাবতীকে দেখে মলয়া অবাক হয়ে বলল, " কী ব্যাপার কালু, হাতে ওগুলো কী?"

"বড়ি। দাদু পাঠিয়ে দিলেন, আটঘরার বড়ি।"

মলয়ার বাবা হরিশঙ্কর তখন বেরোচ্ছিলেন, কলাবতীর কথা কানে যেতেই বসার ঘরে ঢুকে বললেন, "দেখি, কেমন বড়ি।"

চারটে পলিপ্যাক খুলে দেখলেন, গন্ধও শুঁকলেন, তারপর বললেন, "আটঘরার বড়ি? কী আশ্চর্য, মলু ঠিক এইরকম বড়ি আমি পল্লী শিল্পাশ্রম দোকানে দেখেছি, ঠিক এই গন্ধ।"

কলাবতী একটুও না দমে বলল, "জানেন বড়দি, কাকাও ঠিক একই কথা বলেছে আপনার পাঠানো আচার খেয়ে।"

মলয়া বিব্রত হয়ে বলল, "সতুর কথায় আমি কিছু মনে করি না।"

হরিশঙ্করের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। মেয়েকে বললেন, "জ্যাম-জেলি বানাবি বলছিলিস। যখন বানাবি সতুকে সামনে বসিয়ে বানাবি, নয়তো বলবে শেয়ালদার বাজার থেকে কিনে পাঠিয়েছে।" বলেই গটগট করে হরিশঙ্কর বেরিয়ে গেলেন।

কলাবতী নম্র গলায় বলল, "দাদু কিন্তু কাকার এসব কথায় বিন্দুমাত্র কান দেন না। বলে দিয়েছেন, মলুকে বলিস তেঁতুলের ঝাল আচারটা আর একবার যদি খাওয়ায়।"

"জ্যাঠামশাইকে বোলো আমি অবশ্যই পাঠাব, ভাল তেঁতুল আগে পাই। এই বড়ি কে তৈরি করল?"

"পিসি করেছে আর পিসি যা তৈরি করে দাদু তাতেই আটঘরার স্ট্যাম্প মেরে দেয়। আটঘরার শুক্তো, আটঘরার অম্বল, আটঘরার বড়ি। আর এই বড়ি তৈরি করতে গিয়ে পিসি দুটো কাক পর্যন্ত মারল গুলতি দিয়ে।"

"গুলতি।" মলয়ার ভ্রূ আধ ইঞ্চি উঠে গেল। "অপুর মা পেল কোথায়? ওটাও কি আটঘরার?"

"না, না, ওটা এখানকার মালোপাড়ার শ্যামা কামারের তৈরি। বড়দি, শুনলুম আপনিও ছেলেবেলায় গুলতি ছুড়ে কাকার কপাল ফাটিয়েছিলেন, সত্যি?"

"ফাটাইনি, তবে এখন গুলতি পেলে সত্যি-সত্যি ওর মাথাটা ফাটাব। বুড়ো হচ্ছে অথচ কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। কী করে যে ব্যারিস্টারি করে, ভেবে পাই না।"

"কাকাও ঠিক এই কথা বলে, 'মলু যে কী করে হেডমিস্ট্রেসি করে, বুঝতে পারি না।' বড়দি আপনি সত্যি-সত্যি তা হলে কাকার কপাল ফাটাননি?"

"আমাদের বকদিঘির বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় তোমাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। আটঘরা থেকে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছিল সতু। তখন ও ক্লাস নাইনে, আমি সিক্সে। আমাদের পুকুরধারে আছে একটা বিলিতি আমড়ার গাছ, এই বড় বড় যেমন তেমনই মিষ্টি। দেখেই সতুর খাওয়ার ইচ্ছে হল, আমাকে বলল, খাওয়াও। বললুম, কাজের বাড়িতে আমড়া পাড়ার লোক এখন পাব না, তুমি নিজে গাছে উঠে পেড়ে খাও। বাহাদুরি দেখাবার জন্য গাছে উঠল, তারপরই 'ওরে বাবা রে, মরে গেলুম রে' বলতে বলতে ঝপ করে লাফিয়ে নামল। লাল কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়েছে। কালু, এই পিঁপড়ের কামড়ে যে জ্বলুনি তা প্রায় বিছে কামড়াবার মতো। সতুর ধারণা পিঁপড়ের কামড় খাওয়াবার জন্য ইচ্ছে করে ওকে গাছে তুলিয়েছি। খেপে গিয়ে ও একটা মাটির ঢেলা তুলে আমার দিকে ছুড়ল, বলা বাহুল্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তখন আবার একটা ঢেলা তুলল, আমার হাতে ছিল গুলতি আমিও একটা মাটির ঢেলা গুলতি দিয়ে ছুড়লুম। ওর মাথায় লেগে সেটা ভেঙে যেয়। এখন সেটাকেই বলছে ওর কপাল ফাটিয়েছি, অকল্পনীয়! কালু একটা জিনিস জেনে রেখো, গুলতি খুব নিরীহ অস্ত্র নয়। ছোট্ট ডেভিড গুলতি দিয়েই দৈত্য গোলিয়াথকে মেরেছিল।"

এর পর মলয়া খোঁজ নিল নমিতা কেমন পড়াচ্ছে? বলল, "খুব ভাল টিচার, বাংলা আর সংস্কৃতে অসম্ভব ভাল। খুব মন দিয়ে ওর কাছ থেকে বাংলাটা শেখো। আমরা তো বাংলা ভাষাটা শেখার জিনিস বলেই মনে করি না। সেদিন নমিতা এগারো ক্লাসের দুটি মেয়ের খাতা দেখাল। একজন লিখেছে, শেয়ালটা আঙুরের কাঁদি দেখে লোভ সামলাতে পারল না। আর একজন লিখেছে ইংরেজরা বিপ্লবীদের ধরে হাড়িকাঠে ঝোলাত। দেখে কী যে লজ্জা করল কী বলব! কালু তুমি যেন 'কাঁদি' 'হাড়িকাঠ'-এর মতো বাংলা শিখো না।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কলাবতী উঠল বাড়ি ফেরার জন্য। মলয়া তাকে আবার মনে করিয়ে দিল, "গুলতি নিয়ে বেশি ছোড়াছুড়ি কোরো না। দেখতে নিরীহ কিন্তু মারাত্মক হতে পারে।"

রাতে খাবার টেবলে কলাবতী জানাল, হরিদাদু বড়ি দেখে কী বলেছেন। "আমিও বললুম আচার দেখে কাকাও ওই কথা বলেছে।"

সত্যশেখর বাঁ হাতে টেবলে চাপড় মেরে বলল, "এই তো সিংহিবাড়ির মেয়ের মতো কথা। কালু যখনই পাবি বকদিঘিকে ডাউন করে দিবি। তোর কথা শুনে বড়দি কী বলল?"

"কী আবার বলবেন, বললেন তোমার কথায় উনি কিছু মনে করেন না।"

"তার মানে আমাকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য করল।" বলেই সত্যশেখর ছোলার ডালের বাটিটা তুলে মুখে ঢেলে দিয়ে বলল, "মনে করবে কী করে, আমার প্রত্যেকটা কথাই তো সত্যি।"

"তবে কাকা, বড়দি বললেন তোমায় গুলতি দিয়ে মেরেছিলেন সেটা একটা মাটির ঢেলা, মাথায় লেগে ভেঙে গেছল আর তাতে তোমার কপাল ফাটেনি।"

"এই কথা বলল!" সত্যশেখর বজ্রাহতের মতো নিজেকে দেখাবার চেষ্টা করল।

গম্ভীর মুখ করে কলাবতী বলল, "আরও বললেন, এখন গুলতি পেলে সত্যি-সত্যিই তোমার মাথা ফাটাবেন।"

"এই হল রিয়্যাল বকদিঘি। সামনে আচার, আড়ালে অনাচার। এমন একটা মিথ্যা কথা তোকে বলতে পারল?" সত্যশেখরের স্বর হতাশায় ভেঙে পড়ল।

এতক্ষণ রাজশেখর চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন, এবার বললেন, "কালু বলেছিস মলুকে তেঁতুলের আচারটা আর একবার—।"

"বলেছি। ভাল তেঁতুল পেলেই করে পাঠিয়ে দেবেন।"

সত্যশেখর একটুও দেরি না করে বলল, "তার মানে আবার পল্লী শিল্পশ্রীতে ওকে যেতে হবে।"

ছেলের কথায় কান না দিয়ে রাজশেখর বললেন, "ঝালটা যেন আগের মতোই দেয়, এটা ওকে বলে দিতে হবে।" কথাটা তিনি বললেন এটাই বোঝাতে সত্যশেখরের 'শিল্পশ্রী' গল্পটার এতটুকুও তিনি বিশ্বাস করেননি এবং সত্যশেখর সেটা হৃদয়ঙ্গম করে চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

ব্যাগাটেলির গুলি অন্য কাজে

বছর দুয়েক আগে রাজশেখর নিলাম থেকে একটা ব্যাগাটেলি কিনেছিলেন। রাসেল স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে ওটা ছিল, খদ্দেররা অবসরে খুশিমতো খেলত। রেস্টুরেন্ট উঠে যাওয়ায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ব্যাগাটেলিটাও নিলামে আসে। একটা চার ফুট উঁচু টেবলে স্ক্রু দিয়ে আটকানো, সাড়ে তিন ফুট লম্বা এতবড় ব্যাগাটেলি বোর্ড অর্ডার দিয়ে তৈরি করাতে হয়। নাতনির কথা ভেবে রাজশেখর সেটা কিনে নেন।

ছোট বোর্ডের ব্যাগাটেলিতে ঝকঝকে সাদা কাবলিমটরের মাপের লোহার গুলি কাঠের স্টিক দিয়ে ঠেলে দিতে হয়। এই বোর্ডে সেটা করা হয় একটা স্প্রিং টেনে ছেড়ে দিয়ে। গুলি আছে দশটা। স্প্রিং ধাক্কা দেয় বড় আঙুরের সাইজের ভারী ওজনের লোহার গুলিতে। গুলি দু'পাশ চাপা একটা গলি দিয়ে জোরে বেরিয়ে এসে প্রথমে ধাক্কা দেয় একটা পিনে, তারপর এখানে-ওখানে ধাক্কা খেতে খেতে পিন দিয়ে বেড়াব মতো তৈরি গোল গোল ঘরগুলোর একটায় ঢুকে যায়, না ঢুকতে পারলে বোর্ডের নীচে পড়ে যায়। ঘরগুলোয়

নম্বর দেওয়া আছে। যে ক'টা গুলি ঘরে ঢুকবে, যোগ করে তত নম্বর সে পাবে।

দোতলায় লম্বা করিডরের মতো চওড়া দালানে ব্যাগাটেলি বোর্ডটা রাখা হয়। প্রথম প্রথম কলাবতী প্রবল উৎসাহে দু'বেলা খেলত। মাঝেমধ্যে যোগ দিতেন রাজশেখর এবং সত্যশেখর। মাস দুয়েকের মধ্যেই সবার উৎসাহই থিতিয়ে আসে, অবশেষে ব্যাগাটেলিটার ওপর ধুলো জমতে শুরু করে। মুরারি মাঝেমধ্যে ঝাড়ন দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গজগজ করে, "অহেতুক জিনিসটা কেনা হল। খেলবে না যদি তা হলে নীচের মালঘরে পাঠিয়ে দাও।"

পঞ্চু আসার পর কলাবতী ওকে শেখাবার জন্য আবার ব্যাগাটেলি নিয়ে কয়েকদিন খেলতে শুরু করে। একটা টুলে বসে পঞ্চু মন দিয়ে দেখতে দেখতে বোর্ড থেকে একটা গুলি খপ করে তুলে নিল। মাথায় চাঁটি মেরে কলাবতী বলল, "রাখ, যেখানে ছিল রাখ।" পঞ্চু রেখে দিল। এক মিনিট পরেই আবার একটা গুলি তুলে নিল। এবার তার মাথায় চাঁটিটা একটু জোরেই পড়ল। কিছু না বলে কলাবতী কটমট করে তাকিয়ে শুধু আঙুল দিয়ে বোর্ডটা দেখাল। পঞ্চু বোর্ডের ওপর গুলিটা রেখে দিল।

এর পর কলাবতী ব্যাগাটেলি খেলা শেখাতে গেল পঞ্চুকে। ওর হাতটা স্প্রিংয়ের নব-এর ওপর রেখে বলল, "টান, আঁকড়ে ধরে টান।"

কলাবতীর মুখের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে নবটা জোরে টেনেই ছেড়ে চিল। গুলিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে বোর্ডের কিনারে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। লাফাতে লাফাতে লোহার গুলি চলে যাচ্ছে, পঞ্চু তড়াক করে নেমে গুলিটা ধরে ফেলে কলাবতীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

"আবার টান।" পঞ্চুকে টুলে বসিয়ে কলাবতী বলল।

আবার সেই একই ব্যাপার ঘটল। কলাবতী বুঝল মানুষের মতো হাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ওর নেই। গুলিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে দিতেই সে বলল, "তোর দ্বারা ব্যাগাটেলিটা হবে না।" তারপর দুটো আঙুল 'ভি' করে সে বলল, "যা, এটা নিয়ে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু কলাবতীর ঘরে ঢুকল এবং গুলতিটা দু'হাতে ধরে দুলে দুলে হেঁটে এনে দিল। এর পর বোর্ডে আবার ধুলো জমতে শুরু করে।

স্কুলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে কলাবতী। বইপত্তর গুছিয়ে নিয়েছে, এবার অপুর মা টিফিন বক্স আর ওয়াটারবট্‌ল দিয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়বে। মোজা পরে জুতোয় পা গলাতে যাবে তখনই একটা বাচ্চার ভয়ার্ত চিৎকার আর কুকুরের খেঁকানি এবং কিছু মানুষের হইচই শুনে সে ছুটে পেছনের জানলায় গেল, জানলার নীচে সরু পগার গলি। দেখল গলিতে পাঁচ-ছ' বছরের গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা একটি রুগ্‌ণ ছেলে ভয়ে সিঁটিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, তার কিছু দূরে একটা কালো রঙের রাস্তার কুকুর ওপরের ঠোঁটটা টেনে মাড়ি আর সামনের দাঁতগুলো হিংস্রভাবে বার করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে 'গরর গরর' করছে। ওদিকে মালোপাড়া থেকে ছ'-সাতজন পুরুষ ও নারী ছুটে এসে চিৎকার করছে আর কুকুরটার দিকে ইট ছুড়ছে।

একটা ইট গায়ে লাগতেই কুকুরটা লোকগুলোর দিকে তেড়ে গেল। তারা ভয়ে পেছনদিকে ছুট লাগাল, "পাগলা কুকুর, কামড়ে দেবে, কামড়ে দেবে," বলতে বলতে। কুকুরটা ঘুরে আসছে, ছেলেটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

'কিছু একটা এখুনি করতে হবে' কলাবতীর মাথায় দমকলের ঘণ্টার মতো কথাটা বেজে উঠল। সে ছুটে টেব্‌লের ওপর থেকে গুলতিটা তুলে নিয়ে পোড়ামাটির গুলি রাখা পলিপ্যাকটার জন্য এধার-ওধার তাকাল। মনে পড়ল পরশু ওটা অপুর মা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিল, "রাতদিন শুধু গুলতি আর গুলতি, কী কুক্ষণেই যে জিনিসটা বাড়িতে নিয়ে এলুম। এটা এবার আমি ছুড়ে ফেলে দোব।" বলেই প্লাস্টিকের থলিটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। রান্নাঘরটা অপুর মার দুর্গ, সেখানে কলাবতী ইতিপূর্বে যতবার অভিযান চালিয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে। কলাবতী জানে থলিটা সে একসময় ফিরে পাবে, তবে একটু সময় লাগবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে এক সেকেন্ড সময়ও হাতে নেই। এখনই তার গুলি চাই। ছুটে সে ঘর থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল ব্যাগাটেলি বোর্ড আর বোর্ডের ওপর পড়ে থাকা লোহার গুলির ওপর। দুটো গুলি সে মুঠোয় তুলে ঘরে ছুটে গেল। ওয়াটারবট্‌ল আর টিফিন বক্স নিয়ে তখন অপুর মা সবে দোতলায় উঠেছে। দেখল কলাবতী ব্যাগাটেলি বোর্ড থেকে গুলি তুলেই ঘরে ছুটে গেল। কৌতূহলে অপুর মা দ্রুত তার পিছু নিল।

জানলার গরাদের বাইরে গুলতিটা বার করে কলাবতী রবারের ছিলেতে লোহার গুলি লাগিয়ে এক চোখ বন্ধ করে টানল। তার হাত কাঁপছে। কুকুরটা খ্যাক খ্যাক করে ছেলেটার প্রায় গোড়ালির কাছে মাথা নামিয়ে এগিয়ে এসেছে কামড়াবার জন্য। কলাবতী ছিলেটা ছেড়ে দিল।

'কেঁউ' শব্দ করে কুকুরটা ঘুরে পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার সামনে তাকাল। গুলিটা তার উরুতে লেগেছে। সেই সময় অপুর মা তার হাতের জিনিস দুটো মেঝেয় রেখে বলল, "কাকে মারলে?"

"একটা পাগলা কুকুর, ছেলেটাকে কামড়াতে যাচ্ছে।"

চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল অপুর মা'র। কপালে ভাঁজ পড়ল। কলাবতীর হাত থেকে গুলতিটা ছিনিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও।"

কলাবতী ঝটতি তার হাতে দ্বিতীয় গুলিটা তুলে দিল। বিশাল চেহারার অপুর মা গুলতির ছিলেতে গুলি লাগিয়ে জানলার কাছে পৌঁছেই ছিলে টেনে দুই গরাদের মাঝ দিয়ে গুলি পাঠাল।

হতভম্ব কলাবতী ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল অপুর মার দিকে। বাইরে পগার গলি থেকে কুকুরের খ্যাক খ্যাক, ছেলেটার কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। অপুর মা ওয়াটারবট্‌ল আর টিফিন বক্স মেঝে থেকে তুলে বলল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ইস্কুল যেতে হবে না?"

শুনে কলাবতীর সংবিৎ ফিরল। জানলার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। কুকুরটা মাটিতে শুয়ে, মাথা দিয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর ছেলেটা প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে মালোপাড়ার দিকে, সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে বোধ হয় ছেলেটি মা।

"দিব্যি করেছিলুম গুলতি আর ছোঁব না।" চাপাস্বরে গজগজ করে উঠল অপুর মা, "নাও এখন রওনা দাও, ইস্কুলে লেট হয়ে যাবে।"

সত্যি-সত্যিই ডাকাত পড়ল

সেদিন রাত্রে ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। দোতলায় নিজের ছোট্ট ঘরে দু'হাত তুলে অপুর মা উঁচু তাক থেকে নামাচ্ছিল একটা পুরনো তামার থালা। থালার ওপরে ছিল একটা ছোট ভারী কাঠের বাক্স। থালা ধরে টান দিতেই বাক্সটা পড়ে গেল আর পড়ল অপুর মা'র পায়ের পাতার ওপর। 'উহ্‌হ্' বলে সে পা চেপে বসে পড়ে। রাজশেখর টিভি-তে তখন খবর শুনছিলেন, পাশে মেঝেয় বসে মুরারিকে বললেন, "দ্যাখ তো মুরারি, কে যেন উহুহু করল!"

মুরারি লম্বা দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল পঞ্চু বোধ হয় শব্দটা করেছে। সে দু'বার "পঞ্চু, পঞ্চু" বলে ডাকল। সাড়া পেল না। একতলায় পড়ার ঘরে ক্ষুদিরামবাবু চলে যাওয়ার পরও কলাবতী পড়ে। সত্যশেখর এখনও তার চেম্বারে।

মুরারি ফিরে আসছে তখন কানে এল মৃদু একটা কাতরানি। তাড়াতাড়ি অপুর মা'র ঘরে ঢুকে দেখল, এক হাত দিয়ে দেওয়াল ধরে ডান পা মেঝে থেকে সামান্য তুলে অপুর মা দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে, মেঝেয় কাঠের বাক্সটা।

"কী হল? অমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন?"

অপুর মা বাক্সটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওটা পায়ের ওপর পড়ল। যন্তোন্না হচ্ছে মুরারিদা।"

মুরারি দেখল রক্তটক্ত বেরোয়নি শুধু একটু ছড়ে যাওয়ার দাগ আর পাতাটা লালচে। সে বলল, "বোধ হয় থেঁতলে গেছে, তুমি আমায় ধরে আস্তে-আস্তে পা ফেলে কালুদির ঘরে এসে খাটে বোসো। আমি কত্তাবাবুকে খবর দিচ্ছি।"

কথাটা শুনেই রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "মুরারি, শিগগিরি ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে-টা নিয়ে আয়।" তারপর পায়ের অবস্থা দেখে বললেন "এখুনি ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে, হাড় ভেঙেছে কি না কে জানে।"

তখনই সত্যশেখর গাড়ি নিয়ে বেরোল পারিবারিক ডাক্তারকে নিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে ব্যান্ডেজ বেঁধে, দুটো ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য ব্যাগ থেকে বার করে অপুর মা'র হাতে দিয়ে বললেন, "ব্যথা বাড়লে খাবে আর কাল সকালেই এক্স-রে করিয়ে আনুন, বোধ হয় হাড় ভেঙেছে।"

সকাল আটটার আগে বাজারের কাছাকাছি ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারের এক্স-রে ইউনিট চালু হয় না। কলাবতীর কাঁধ ধরে অপুর মা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দোতলা থেকে নেমে সদর দরজার সামনে এনে রাখা মোটরে কলাবতীকে নিয়ে পেছনে উঠল, সামনে সত্যশেখরের পাশে থলি হাতে মুরারি, সে যাবে বাজারে এবং বাজার করা সেরে হেঁটেই ফিরে আসবে।

আধঘণ্টা বসে থাকার পর অপুর মা'র পায়ের এক্স-রে হল, নেগেটিভ ও রিপোর্ট পাওয়া যাবে সন্ধ্যায়। সত্যশেখর বলল, "কোর্ট থেকে ফেরার সময় আমি নিয়ে নোব।"

তিনজনে ফিরছে, বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল রাস্তায় গাড়ি জমে উঠেছে। জ্যাম শুরু হয়েছে। সত্যশেখর জানলা দিয়ে মুখ বার করে জ্যামের কারণটা বোঝার চেষ্টা করে কলাবতীকে বলল, "কালু নেমে দ্যাখ তো ব্যাপার কী? বাড়ির এত কাছে এসে শেষে কি না ফেঁসে গেলুম।"

গাড়ি থেকে নেমে কলাবতী দু'পা হেঁটেই পেল আশা ভ্যারাইটি স্টোর্স।এর মালিক বিশ্বনাথ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটা জটলাকে উত্তেজিত স্বরে বিবরণ দিচ্ছে। কলাবতী দাঁড়িয়ে শুনল, "ঝড়ের মতো মারুতি ভ্যানটা যাচ্ছে আর তার পেছনে "ডাকাত, ডাকাত" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মোটরবাইকে তাড়া করে চলেছে একটা লোক। দোকান থেকে আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম ভ্যানটা একটা অ্যাম্বাসাডারকে ওভারটেক করে আবার একটা অটো রিকশাকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ল সামনে থেকে আসা লরির। শিওর অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে ওই স্পিডের ওপরই ভ্যানটা ডানদিকের ফুটপাথে উঠে গিয়ে ধাক্কা মারল সিংহিদের বাউন্ডারি ওয়ালে। তারপর দেখলুম, চারদিকের লোকজন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আর গাড়িটা থেকে তিনটে লোক বেরিয়ে এল। একজনের হাতে পিস্তল। তিনজন এধার-ওধার তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজল। শেষকালে সিংহিদের উত্তর দিকের পাঁচিলের গা দিয়ে যে সরু মাটির রাস্তাটা পগার গলিতে গেছে সেটা দিয়ে ওরা ছুটে পালাল। মনে হচ্ছে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে।"

শুনতে শুনতে কলাবতীর গা ছমছম করে উঠল। তাদেরই বাগানের দেওয়ালে ডাকাতদের মারুতির ধাক্কা আর পাঁচিলের পাশের রাস্তা দিয়েই তিনটে ডাকাত পালিয়েছে, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তাদের একজনের হাতে আবার পিস্তল। একজনের হাতে থাকলে বাকি দু'জনের সঙ্গেও পিস্তল বা রিভলভার বা ভোজালিটোজালিও নিশ্চয় আছে। এ তো গল্পের বা সিনেমার নয়, সত্যিকারের ডাকাত! কলাবতীর গায়ে কাঁটা দিল।

ধাক্কা দেওয়া মারুতিটা ঘন নীল রঙের, দূর থেকেই কলাবতী দেখতে পেল তাদের পাঁচিলে লেগে রয়েছে মোটরটার মাথা, পেছনের স্লাইডিং দরজাটা হাট করে খোলা। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাটার প্রাথমিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে লোকজন এগিয়ে এসেছে। জিন্স আর টি-শার্ট পরা যে যুবকটি মোটরবাইকে তাড়া করেছিল সে তখন ভিড়ের নায়ক। কলাবতী এগিয়ে গেল তার কথা শুনতে।

"দেখছেন তো ওই লোকটাকে ফেলে পালিয়ে গেল।" যুবকটি আঙুল দিয়ে কাছেই দাঁড়ানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কাঁচাপাকা চুলের এক প্রৌঢ়কে দেখাল। বিভ্রান্তি আর আতঙ্ক প্রৌঢ়ের চোখে-মুখে ছড়িয়ে।

"বাড়ি থেকে উনি বেরিয়েছেন গাড়িতে উঠবেন বলে। তার আগেই মারুতিটা ওঁর গাড়ির সামনে দাঁড় করানো ছিল। নিজের গাড়ির দিকে উনি যাচ্ছেন, আমি তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলুম। দেখলুম দুটো লোক মারুতি থেকে বেরিয়ে এসে ওঁকে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। আধ মিনিটও লাগল না। দেখেই আমি মোটরবাইকে স্টার্ট দিলুম।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে ধরে গাড়িতে তুলল কেন?"

বিরক্ত স্বরে যুবকটি বলল, "কেন তুলল তা আমি কেমন করে জানব? হতে পারে কিডন্যাপ করার জন্য। ভদ্রলোক শেয়ার মার্কেটের একজন বড় দালাল, একই পাড়ায় আমরা থাকি, বিশাল বড়লোক, ওঁর কাছ থেকে পনেরো-কুড়ি লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করবে বলে হয়তো এটা করেছে কিংবা অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। মুক্তিপণ আদায় করাটাও তো এখন বেশ ভাল ব্যবসা।"

একটা পুলিশের জিপ এসে থামল। সাদা পোশাকের এক খুদে অফিসার আর এক খাকি কনস্টেবল নামলেন।

"কী করে হল অ্যাকসিডেন্ট? কারা কারা দেখেছেন? কেউ মারা গেছে কি? ডেডবডি তো দেখছি না, গাড়ির লোকেরা কোথায়?" ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পুলিশ অফিসার সবার উদ্দেশে প্রশ্নগুলো ছুড়ে ছুড়ে দিলেন। মারুতির ভেতরে উঁকি দিলেন। কনস্টেবলকে বললেন, "তাড়াতাড়ি রাস্তা ক্লিয়ার করো।"

"গাড়ি থেকে তিনটে ডাকাত নেমে এই গলিটা দিয়ে সার পালিয়েছে।"

"অ্যাঁ, ডাকাত!"

"হ্যাঁ সার, হাতে পিস্তল ছিল।"

অফিসার দ্রুত জিপে ফিরে গেলেন। কলাবতীও ফিরে এল মোটরে।

"কালু, ব্যাপার কী?" সত্যশেখর মোটরে স্টার্ট দিল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

"একটা মারুতি ভ্যানে ডাকাত পালাচ্ছিল একটা লোককে তুলে নিয়ে। মারুতিটা আমাদের পাঁচিলে ধাক্কা মেরেছে। ডাকাতগুলো তারপর নেমে পালিয়েছে পগার গলির দিকে।" কলাবতী উত্তেজিত গলায় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল দ্রুত।

ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে সদর দরজার সামনে এসে সত্যশেখর নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "ডাকাত যে তার প্রমাণ কী?"

"একজনের হাতে পিস্তল ছিল।"

"অ। তা হলে ডাকাত নয়, তোলাবাজ।" সত্যশেখর সদর দিয়ে ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল কলাবতী আর অপুর মাকে আগে যেতে দিয়ে। "আস্তে-আস্তে পা ফেলে উঠবে, কালুকে ভাল করে ধরো, নয়তো—।" ঠিক সেই সময় তার কানের কাছে চাপা স্বরে কে যেন বলল, "একটি কথাও নয়, চুপ করে থাকুন।"

সিংহের গুহায় সিংহ

সত্যশেখর চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল। পিঠে একটা শক্ত কিছুর খোঁচা। সে দু'পা এগিয়ে যেতেই আরও দুটো লোক চটপট ভেতরে ঢুকে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। পেছনের লোকটিকে সত্যশেখর মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই পিঠে একটু জোরে খোঁচা লাগল।

"বাড়িতে আর আছে কে কে? বাড়ি থেকে বেরোবার আর দরজা আছে?"

"ওই দু'জনের একজন আমার ভাইঝি, অন্যজন অপুর মা, আর আছেন বাবা, দু'জন কাজের বউ আর মুরারি। সে গেছে বাজারে,

এখুনি আসবে। বাড়িতে ঢোকা-বেরনোর একটাই দরজা।"

"ভেবো, দ্যাখ তো কাজের মেয়েমানুষ দুটো আছে কোথায়, বাড়ি থেকে ওদের বার করে দে।"

ভেবো ছিপছিপে, লম্বা, বয়স কুড়ির বেশি নয়। মাথায় কদমছাঁট চুল, পরনে কালো ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট, গলায় সরু সোনার চেন। ডান হাতে ঘড়ি। ভেবোর চোখ দুটো সামান্য ট্যারা, চোখের নীচে হনুর হাড় দুটি উঁচু। হাত দুটো সরু ও দীর্ঘ। হুকুম পেয়ে ভেবো পিঠের দিকে ট্রাউজার্সে গোঁজা একটা ছুরি বার করে স্প্রিং টিপল। লাফিয়ে বেরোল একটা দু'ইঞ্চি ঝকঝকে ফলা। ছুরিটা হাতে নিয়ে যখন সে সিঁড়ির পাশ দিয়ে রকের দিকে এগোল তখন কলাবতী ও অপুর মা দোতলার সিঁড়ির পঞ্চম ধাপে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ভেবোকে দেখছে।

"পিসি,এরা তো সত্যি ডাকাত, কী হবে এখন?" কলাবতীর গলা থেকে প্রায় চিঁচিঁ করে শব্দ বেরোল।

অপুর মা তীক্ষ্ণ চোখে ডাকাতদের লক্ষ করে যাচ্ছিল। এবার কলাবতীর হাতে একটা টিপুনি দিয়ে চাপা স্বরে বলল, "ভয় পেও না, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।" তারপর সে সত্যশেখরকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল, "ছোটকত্তা, আমি ওপরে যাচ্ছি, কত্তাবাবুকে মিছরির শরবত এখনও দেওয়া হয়নি।"

"রাধু।"

বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা, মিশকালো, বছর ত্রিশের তৃতীয় ডাকাতটি ডাক শুনেই বলল, "বলো গুরু।"

গুরু চোখের ইশারায় রাধুকে ওপরে যেতে বলল, রাধু সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অপুর মা'র পাশ দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

যাকে গুরু বলে সম্বোধন করল রাধু সেই যে দলনেতা, সেটা তিনজনেই বুঝে গেল। সত্যশেখর এবার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। গুরুর হাতে ধরা অস্ত্রটি দেখেই সে চিনে ফেলল ওটি ওয়েবলি স্কট রিভলভার। তার মুখের ভীত ভাব এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারাটি দেখে গুরু জিনসের ডান হিপপকেটে রিভলভারটি ঢুকিয়ে রাখল। বাঁ দিকের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে মোবাইল ফোন।

"আপনার নাম কী?" গুরু জানতে চাইল।

"সত্যশেখর সিংহ।"

"সত্যবাবু, আমরা ডাকাতি করার জন্য এ-বাড়িতে ঢুকিনি। নেহাত বিপদে পড়েই আশ্রয় নিতে ঢুকে পড়েছি। নিরাপদে আমরা চলে যেতে চাই কিন্তু যাওয়ার আগে পর্যন্ত আপনাদের আমরা আটকে রাখব। আর আশা করব ততক্ষণ অন্য কিছু করার চেষ্টা আপনারা করবেন না।"

বছর ত্রিশ বয়স, পরিষ্কার শিক্ষিত উচ্চারণ। কথা বলার ভঙ্গি মার্জিত। চেহারাটা একদমই ডাকাতের মতো নয়। চওড়া কাঁধ, গায়ে সেঁটে থাকা লাল গেঞ্জির মধ্যে থেকে বুকের ও বাহুর পেশিগুলো ফুলে রয়েছে, পায়ে স্নিকার। চোখ দুটি টানা এবং শান্ত।

সত্যশেখর এবার ভরসা করে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কী?"

"রঞ্জন সিংহ।" বলেই হেসে ফেলল রঞ্জন, "আমরা দু'জনেই সিংহ। আশা করি সিংহের গুহায় আমরা অশান্তি ঘটাব না। তবে আমার শাগরেদ দু'জন সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছি না। ওই যে ভেবো ছেলেটা, ওর মানসিক ভারসাম্যটা সামান্য কম, অত্যন্ত অপরিণত, বেড়ালের মতো চলাফেরা আর ছোরাটা খুব ভাল ব্যবহার করে এবং সামান্য কারণেই সেটা করে থাকে। অন্তত আটজনের শরীরে ও ছোরা ঢুকিয়েছে এই বয়সেই। আর যাকে রাধু বলে ডাকলুম—কোথাও একটু বসা যাক এবার।"

ভেবোর কথা শুনতে শুনতে সত্যশেখরের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছিল। রঞ্জনের প্রস্তাব শুনে তাড়াতাড়ি বলল, "নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার চেম্বারে আসুন। বসে কথাবার্তা বলবেন।"

তখনই দেখা গেল শকুন্তলা আর কান্তির মা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে সদর দরজার দিকে পায়ে পায়ে চলেছে, তাদের পেছনে ছোরা হাতে একগাল হাসি নিয়ে ভেবো। দরজার একটা পাল্লা খুলে ছোরাটা নেড়ে ভেবো ওদের বেরিয়ে যাওয়ার ইশারা করামাত্র সৌরভ গাঙ্গুলির একষ্ট্রা কভার ড্রাইভ মারা বলের মতো শকুন্তলা ও কান্তির মা বেরিয়ে গেল। দরজার ভারী খিল আর তিনটে ছিটকিনি আটকে দিয়ে ভেবো তাকাল রঞ্জনের দিকে।

রঞ্জন বলল, "একতলা দোতলা ছাদ ভাল করে দেখে নে, বাইরে থেকে বাড়িতে ঢোকার কোনও রাস্তা আর আছে কিনা, আর দেখে নে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। কোনও জিনিসে হাত দিবি না, রাধুকে বলে দিস।"

সত্যশেখরের চেম্বারে ঢুকেই রঞ্জনের চোখ পড়ল সার দেওয়া মোটা মোটা আইনের বইয়ের দিকে। বইয়ের তাকগুলো প্রায় দু' মানুষ উঁচু। স্টিলের একটা ঘরাঞ্চিতে উঠে বই পাড়তে হয়।

"মনে হচ্ছে আপনি একজন উকিল।"

সত্যশেখর ছোট্ট জবাব দিল,"হ্যাঁ।"

"আমিও হতে পারতুম, এক বছর ল কলেজে পড়েছি।"

রঞ্জন এইটুকু বলেই কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, রাধুর কথা বলছিলুম, ওর নামে এগারোটা ডাকাতির, চারটে খুনের মামলা রয়েছে, জেল ভেঙে পালিয়ে আমার কাছে আসে তিন মাস আগে। ওর বাড়ি ক্যানিংয়ে। টাকার আর সোনার দিকে অসম্ভব লোভ।"

সদরে কলিং-বেল বাজল। রঞ্জন লাফ দিয়ে জানালায় গিয়ে হিপ পকেটে হাত রেখে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সদর দরজার দিকে তাকাল। বাজারের দুটি থলি দু' হাতে ঝুলিয়ে এক বুড়োমানুষকে দেখে তার চোখে স্বস্তি ফুটে উঠল।

"বোধ হয় মুরারি, ভেবেছিলুম পুলিশ।"

রঞ্জন গিয়ে দরজা খুলল। অপরিচিত লোক দরজা খুলে দিল দেখে মুরারি অবাক! চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে সত্যশেখর। তাকে দেখে মুরারি বলল, "ছোটবাবু, বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে! গেটের বাইরে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে, শকুন্তলা চেঁচাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি থেকে দেখলুম পাঁচ-ছ'জন নামল বন্দুক নিয়ে।" কথাগুলো বলার সময় মুরারির চোখে ভয়ের থেকেও বেশি ছিল অবাক হওয়া।

"সত্যবাবু, আপনাকে এখন একটা কাজ করতে হবে।" রঞ্জনের স্বর প্রখর হয়ে উঠল। তার শরীরের ভঙ্গিতে এসেছে কাঠিন্য। "বাইরে গিয়ে পুলিশকে বলুন, তারা যেন এই বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা একদমই না করে। করলে যা ঘটবে সেটা খুবই দুঃখের হবে এই বাড়ির লোকদের কাছে। ছোরা আর রিভলভার তা হলে কাজ করবে আপনাদের ওপর। পুলিশকে বলুন হঠকারী না হতে। আপনার বাবা বা ভাইঝি কিংবা আপনি মারা গেলে সেজন্য দায়ী হবে কিন্তু পুলিশ। আর বলবেন দায়িত্ববান হাই র‍্যাঙ্কিং কোনও অফিসার ফোনে আমার সঙ্গে যেন কথা বলেন। আপনার চেম্বারের ফোনের নম্বরটা দিয়ে দেবেন। আপনি ল ইয়ার, গুছিয়ে অল্প কথায় বুঝিয়ে দেবেন আপনারা এখন হোস্টেজ হয়ে পড়েছেন, পুলিশ অ্যাকশান নিলেই আপনারা হবেন মৃত।"

রঞ্জন সদর দরজার একটা পাল্লা খুলে বলল, "স্বাভাবিক ভাবে যাবেন, সেইভাবেই ফিরে আসবেন।" সত্যশেখর ঢোক গিলে মাথা নেড়ে বেরোল। রঞ্জন পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ চোখে। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে সত্যশেখরের তুঁতে রঙের মারুতি হাজার।

রাধু দোতলায় উঠেই লম্বা দালানটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চোখ ফেলল। সেখানেই রাজশেখরের শোয়ার ঘর। ঘরটা খোলা। রাজশেখর তখন বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ছিলেন। রাধু প্রথমে দালানের ডান দিকের ঘরগুলোর পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখল কেউ আছে কি না। প্রথম ঘরটি সত্যশেখরের, তার পরেরটি কলাবতীর। সেই ঘরের মধ্য দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়, সেটা অপুর মার, তারপর লাইব্রেরি ঘর, এখানেও রাধু কাউকে পেল না। রাজশেখরের ঘরে না ঢুকে দালানের বাঁ দিকে দুটো বাথরুম এবং খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল। বসার বিরাট ঘরটার একদিকে দুটো বড় দরজা, খুললেই

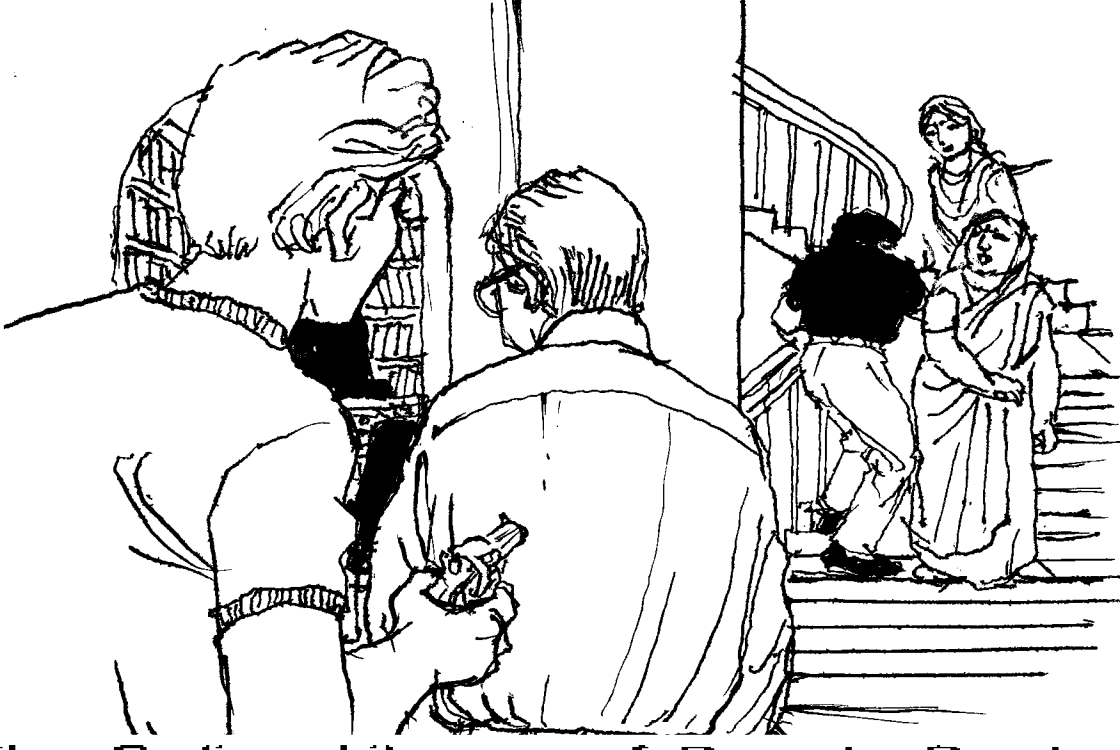

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রেলিং-ঘেরা ছাদ। ছাদের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাড়ির গেটের কাছে ভিড় এবং রাইফেল হাতে পুলিশ দেখে পিছিয়ে এল।

এবার রাধু নিঃসাড়ে ঢুকল রাজশেখরের ঘরে। চোখের সামনে তুলে ধরা খবরের কাগজের জন্য তিনি দেখতে পাননি রাধুকে।

"দাদু, পেপার পড়ছেন? পড়ুন, পড়ুন।"

ঘরে অপরিচিত স্বর হঠাৎ কাছের থেকে শুনে রাজশেখর চমকে কাগজ নামিয়ে বললেন, "কে? কী চাই তোমার?"

ততক্ষণে অপুর মা ও কলাবতী হাজির হয়ে গেছে।

অপুর মা বলল, "কত্তাবাবু ও হল একজন ডাকাত, নীচে আরও দু'জন আছে ছোরা আর ছোট বন্দুক নিয়ে। ছোটকত্তাকে নীচে ধরে রেখেছে।"

রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন। "এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দিনেদুপুরে বাড়িতে এভাবে ঢুকে ডাকাতি করে যাবে, তাও কখনও হয়!"

তিনি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দেওয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে আড়াআড়ি রাখা দোনলা বন্দুকটার দিকে এগিয়ে যেতেই রাধু পেছন থেকে রাজশেখরের ঘাড়ে জোরে ধাক্কা দিল। তিনি ছিটকে পড়লেন, খাটের বাজুতে ঠুকে কপাল লাল হয়ে উঠল।

"দাদু!" কলাবতী আর্তনাদ করে রাজশেখরকে জড়িয়ে ধরল।

"কত্তাবাবুর গায়ে এভাবে হাত তুললে!" স্তম্ভিত অপুর মা। "অ্যাতো বড় আস্পদ্দা।" রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে।

রাধু ততক্ষণে বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই দেখে নিল নলের মধ্যে কার্তুজ ভরা আছে কি না। নেই দেখে হাত বাড়াল রাজশেখরের দিকে, রুক্ষ গলায় হুকুমের স্বরে বলল, "টোটাগুলো কোথায়? এখনই আমায় দিন।"

"নআআআ।" রাজশেখরের চিৎকারে রাধু মুখ বিকৃত করল। কড়া গলায় সে বলল, "সোজা আঙুলে দেখছি ঘি উঠবে না।"

বন্দুকটা তুলে কুঁদো দিয়ে সে রাজশেখরের পিঠে আঘাত করল।

"দাদুকে মারবে না, মারবে না" বলে কলাবতী দু'হাত ছড়িয়ে রাজশেখরকে আড়াল করে দাঁড়াল।

এক হাতে বন্দুক ধরে অন্য হাতে রাধু "সর সামনে থেকে" বলে কলাবতীকে ঝটকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপুর মা বন্দুকটা রাধুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েই কুঁদোটা তার ডান কাঁধে কোপ মারার মতো বসিয়ে দিল।

"আহহ্" বলে রাধু কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। সেই সময় ঘরে ঢুকল রঞ্জন আর সত্যশেখর।

"কাকা, এই দ্যাখো দাদুর কপাল, ওই লোকটা মেরেছে।" কলাবতী ছুটে গেল কাকার কাছে। "বন্দুকটা দিয়ে পিঠেও মেরেছে।"

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সত্যশেখর বলল, "একজন নিরীহ বৃদ্ধ মানুষকে এভাবে যে আপনার লোক মারবে, আমি ভাবতেও পারি না। এখন থেকে আপনাদের শত্রু বলে গণ্য করব।"

থমথমে হয়ে গেল রঞ্জনের মুখ। গম্ভীর গলায় সে রাধুকে বলল, "নীচে যাও, একদম ওপরে উঠবে না।"

এখন থেকে শত্রুতা

বাঁ হাত দিয়ে কাঁধটা চেপে ধরে রাধু অনিচ্ছুকের মতো ঘর থেকে বেরোবার আগে তীব্র দৃষ্টিতে অপুর মাকে দেখে নিল। অপুর মাও দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল কড়া চোখে তাকিয়ে। রঞ্জন সেটা লক্ষ করল। বন্দুক তখনও অপুর মা'র হাতে ধরা। রঞ্জন হাত বাড়িয়ে বলল, "ওটা দাও।"

"না।" অপুর মা বন্দুকটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল।

ঘরের সবাইকে স্তম্ভিত করে রঞ্জন প্রচণ্ড জোরে অপুর মাকে চড় মারল। অপুর মা'র বিশাল শরীর সেই বিরাশি সিক্কা চড়ের ধাক্কায়

ঘুরে খাটের ওপরে পড়ে গেল। রঞ্জন বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে সত্যশেখরকে বলল, "শত্রুতাটা তা হলে এখন থেকেই শুরু হল।" তার দু' চোখ দেখে সত্যশেখর অবাক! কোথায় সেই চাহনির শান্ততা, হিংস্র জানোয়ারের মতো জ্বলছে চোখ দুটো! লোকটা মুহূর্তে বদলে গেছে।

বন্দুক হাতে রঞ্জন ঘর থেকে বেরোবার আগে রিভলভারটা হিপপকেট থেকে বার করে কলাবতীর রগে ঠেকিয়ে বলল, "নীচে চলো। তুমিই হবে হোস্টেজ।" এই বলে সে কলাবতীর কপালে নলের ঠোক্কর দিল।

"ওকে নয়, আমাকে হোস্টেজ করুন।" সত্যশেখর হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলল।

"না, না, এই মেয়েটিই হবে। পুলিশ যদি কোনও চালাকি খেলতে যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে একে গুলি করব, তারপর একে একে—।" ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা কঠিন গলা রঞ্জনের।

মাথা ঘুরছে কলাবতীর, চোখে ঝাপসা দেখছে, কানে শব্দ ঢুকছে না। মাথার মধ্যে তখন পিসির একটা কথা ভীমরুলের মতো বোঁ বোঁ করে চলেছে—'ভয় পেয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা রাখো'। দালান দিয়ে হেঁটে নীচের সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময় সে দেখল ছাদের সিঁড়ির খোলা কোলাপসিবল্ গেট দিয়ে পঞ্চু দ্রুত উঠে গেল।

কলাবতী, রঞ্জন এবং তাদের পেছনে সত্যশেখর একতলায় এল। চেয়ারে বসে সত্যশেখরের টেব্‌লে পা তুলে ভেবো ছোরা দিয়ে শশার খোসা ছাড়াচ্ছিল, চারটে টোম্যাটো, দুটো পেয়ারা, আধডজন মর্তমান কলা টেব্‌লে সাজিয়ে রাখা। ঘরের এককোণে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মুরারি, পায়ের কাছে বাজারের থলি, ফলগুলো স্যালাডের জন্য সে বাজার থেকে এনেছে। অন্য একটা চেয়ারে বসে রাধু। বাঁ হাত ডান কাঁধে, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। ডান হাতের কনুইটা সে রেখেছে চেয়ারের হাতলে, রঞ্জন ইশারায় কলাবতীকে একটা খালি চেয়ার দেখাল।

"এই বুড়ো খানিকটা নুন আন তো! নুন ছাড়া শশা পেয়ারা খাওয়া যায় না। জলদি।" ভেবোর হুকুম শুনেই মুরারি ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে গুরু।" রাধু বলল রঞ্জনকে। "একটা ব্যান্ডেজ-ফ্যান্ডেজ করলে ভাল হত। হাড়টা ভাঙল কি না বুঝতে পারছি না। মেয়েমানুষ দেখে এতটা আর সাবধান হইনি। জব্বর হাঁকিয়েছে, গায়ে যে অত জোর আছে বুঝতে পারিনি।" আক্ষেপে কাতরে উঠল রাধু।

রঞ্জনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। জানলার কাছে গিয়ে বাইরে ফটক পর্যন্ত দেখে সে সত্যশেখরকে বলল, "আপনি ও সি-কে ঠিকভাবে বলেছেন তো? ফোন নম্বরটা দিয়েছেন?"

"আমার কার্ড ওর হাতে দিয়ে বলেছি ফোনে তাড়াতাড়ি যেন কমিশনার কথা বলেন।"

রাধু আবার কাতরে উঠল। রঞ্জন ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, "কী হয়েছে কী? বাচ্চা ছেলের মতো প্যানপ্যান করছিস কেন? ভেবো, ওপরে গিয়ে দ্যাখ তো ব্যান্ডেজ করার মতো ফালি কাপড়টাপড় পাওয়া যায় কি না।"

একমুঠো নুন প্লেটে করে নিয়ে এল মুরারি। শশায় নুন মাখিয়ে কামড় দিয়ে ভেবো বলল, "এটা খেয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ভীষণ খিদে পেয়েছে, রাধুদা যাবে নাকি?"

"রাখ তোর খাওয়া।" বিরক্ত হয়ে বলল রাধু, তারপর কলাবতীকে জিজ্ঞেস করল, "খুকি, বাড়িতে ব্যান্ডেজ আছে?"

"আছে।" কলাবতী শান্তস্বরে বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

রাধু উৎসুক চোখে তাকাল রঞ্জনের মুখের দিকে। রঞ্জন বলল, "ভেবো, ওর সঙ্গে যা।"

ছোরাটা টেব্‌লে রেখে ভেবো উঠল। কলাবতীর পেছন পেছন কয়েক পা যেতেই রঞ্জন তাকে ডেকে ছোরাটা দেখাল, ভেবো ফিরে এসে সেটা তুলে নিল। দোতলায় উঠেই দালানের দেওয়াল ঘেঁষে জুতো রাখার র‍্যাক। ভেবো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তুমি ব্যান্ডেজ নিয়ে এসো, আমি বরং জুতো দেখি। বাব্বা, এত জুতো কার?"

"সবার জুতো আছে, তবে বেশিরভাগই কাকার।"

ভেবো জুতোগুলো তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "চামড়ার কী চেকনাই! কী জেল্লা! খুব দামি, তাই না?"

"ওটার দাম বারোশো টাকা।" বলেই কলাবতী দেখল ভেবোর চোখে লোভ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"আর এটা?" ভেবো একজোড়া জগিং শু তুলে ধরল।

"আড়াই হাজার টাকা।"

কলাবতী লাইব্রেরি ঘরের দেওয়াল আলমারি খুলে ফার্স্ট এইড বক্স বার করে দালানে এসে দেখল মেঝেয় বসে ভেবো কাকার জগিং শুটা পরছে, পাশে পড়ে রয়েছে তার ময়লা পুরনো জুতো আর ছোরাটা। কলাবতীকে দেখে সে লাজুক হেসে বলল, "এটা আমি নিলুম। একটু ঢলঢল করছে, ন্যাকড়া গুঁজে নোবখন।"

কৌতূহলমেশানো স্বরে কলাবতী এবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা ঢুকলে কী করে আমাদের বাগানে?"

ভেবো তাজ্জব বনে গিয়ে বলল, "এ আর এমন কী, রাধুদা তুলে ধরল আমাকে, পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে খিড়কি দরজাটা খুলে দিলুম।"

সেই সময় ছাদের সিঁড়িতে উঁকি দিল পঞ্চু। তাকে দেখেই কলাবতী দ্রুত হাত নেড়ে ইশারা করল সরে যাওয়ার জন্য। সেটা দেখতে পেয়েই ভেবো চট করে মুখ ফিরিয়ে ছোরাটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে সন্দেহাকুল স্বরে বলল, "কাকে দেখে হাত নাড়লে?"

"একটা বানর।"

"বানর! বাড়িতে বানর কেন? খুব খারাপ জানোয়ার, ছেলেবেলায় একটা হনুমান আমাকে কামড়ে দিয়েছিল, পেটে চোদ্দবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল সদর হাসপাতালের ডাক্তার, সে যে কী ব্যথা, বলে বোঝাতে পারব না। পাগলা কুকুরে কামড়ালেও চোদ্দটা।"

"বানর আর হনুমান এক জানোয়ার নয়।" কলাবতী সংশোধন করে দিল।

পঞ্চু আবার উঁকি দিল এবং ভেবো তাকে দেখে ফেলল। ছোরাটা তুলে ধরে সে পঞ্চুর দিকে ছুড়ে মারার ভঙ্গি করে বলল, "এইসব জানোয়ার দেখলে আমার ভয় করে। চলো,চলো, নীচে চলো।"

নীচে এসে কলাবতী দেখল রঞ্জন কার সঙ্গে টেলিফোনে রুক্ষভাবে কথা বলছে। ব্যান্ডেজটা রাধুকে দেখিয়ে কলাবতী বলল, "স্কুলে সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের ট্রেনিং নেওয়া আছে আমার। ব্যান্ডেজ করে দোব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই করে দাও খুকি।" রাধুর স্বর নরম, চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। কলাবতীর মাথার মধ্যে তখন 'ভয় পেও না, ভয় পেও না, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথা ঠাণ্ডা রাখো' গুনগুন করে যাচ্ছে।

"জামা না খুললে ব্যান্ডেজ করব কী করে?"

রাধু জামা খোলার জন্য হাত তুলতে গিয়ে "উহহ" বলে কাতরে উঠল।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।" ভেবো এগিয়ে এল। রাধুর বুকের কাছ থেকে ছোরা দিয়ে সে ফরফর করে জামাটার তলা পর্যন্ত টেনে ফাঁক করে দিল। এর পর জামাটা দেহ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ওপরে অনেক হাওয়াই শার্ট দেখেছি, একটা পরে নিও।"

রাধুর ডান হাতটা বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে কলাবতী কাঁধ বুক ও বাহু বেষ্টন করে শক্তভাবে জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল। রাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "ওরে ভেবো, আমি যে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়লুম। ডান হাত যে নাড়াতে পারছি না।"

ভেবো একটা টোম্যাটো তুলে কামড় দিয়ে চেয়ারে বসে চিবোতে চিবোতে বলল, "এখন ওইভাবেই থাকো, পরে ডাক্তার দেখিয়ে যা করার করবে। কেন মিছিমিছি ওই মেয়েটাকে রাগাতে গেলে বলো

তো? চেহারা দেখে বুঝতে পারোনি গায়ে জোর কত?"

"চুপ মার ভেবো।" রাধু রাগে ধমকে উঠল, "গায়ের জোর আমারও আছে। নেহাত হুঁশ করিনি ততটা, তাই মারটা খেলুম। একবার পাই হাতের মুঠোয়, ওই বন্দুক দিয়ে মাথা ফাঁক করে দোব।"

দাঁত কিড়মিড় করে রাধু বন্দুকটা বাঁ হাতে টেনে নিল। রঞ্জন ফোন রেখে রাধু আর ভেবোর দিকে তাকিয়ে বলল, "পুলিশ রাজি হয়েছে।"

দু'জনে অবাক হয়ে তাকাল। ভেবো বলল, "কিসের রাজি?"

"এখান থেকে আমাদের নির্বিঘ্নে যেতে দেবে।"

রাধু বলল, "অমনি অমনি চলে যেতে দেবে?"

রঞ্জন চেয়ারে বসে বলল, "এমনি কী আর খেতে দেয়, দাবার চাল চালতে হয়েছে। তুমি আমার গজ খেলে আমি তোমার ঘোড়া খাব। তুমি আমায় গুলি মারলে আমি এই মেয়েটার মাথায় গুলি মারব। তুমি পুলিশ, নাগরিকদের প্রাণরক্ষা করা তোমার কাজ, এবার তাই করো।" রঞ্জন মুচকি মুচকি হাসল।

যে টানটান ভাবটা তার মুখে ছিল, এখন সেটা আলগা দেখাচ্ছে। টেব্‌ল থেকে পেয়ারা তুলে ছোরা দিয়ে সেটা দু'টুকরো করে রঞ্জন নুন মাখাতে মাখাতে রাধুকে বলল, "খালি গায়ে এইরকম ব্যান্ডেজ জড়িয়ে তুমি যাবে নাকি? একটা জামা চড়িয়ে নাও। ভেবো, একটা জামা এনে দে তো।"

শোনামাত্র ভেবো উঠে দাঁড়াল। ছোরা দিয়ে রঞ্জন আধখানা পেয়ারাটা আবার টুকরো করছে মন দিয়ে। ভেবো ছোরাটা চাইতে গিয়েও আর চাইল না। তাকে চলে যেতে দেখে রঞ্জন ছোরাটা বাড়িয়ে ধরে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। বরং রাধু বলল, "অস্তর সবসময় কাছে রাখা উচিত। এটা ভেবোর খেয়াল থাকে না। কখন দরকার পড়বে কে জানে।"

রঞ্জন বলল, "সত্যবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনার মোটরে আমাদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন। অবশ্য সঙ্গে থাকবে আপনার এই ভাইঝি। পুলিশের যে কাণ্ডজ্ঞান আছে সেটা এবার বুঝলুম, ওরা একঘণ্টার মধ্যে জানাবে নির্বিঘ্নে আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেবে কি না, আর দেবে নাই-বা কেন?"

"ডাকাতি করিনি, প্রাণহানিও করিনি, শুধুমাত্র শেল্টার নিয়েছি। এতে অপরাধ কোথায়?"

সত্যশেখর বলল "কিডন্যাপিংয়ের উদ্দেশ্যে একজনকে গাড়িতে তুলেছিলেন সেটা গুরুতর অপরাধ। তা ছাড়া এই বাড়িতে দু'জনকে আপনারা আঘাত করেছেন, তারা মারাও যেতে পারত, এটাও গুরুতর অপরাধ। বাড়ির বাইরে ভয় দেখিয়ে মানসিক আঘাত দিয়েছেন, সেটাও অপরাধ বলে গণ্য হবে।"

রঞ্জন পেয়ারা শেষ করার পর মর্তমানের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "হুম্‌ম।"

ভেবো ও পঞ্চু

ওদিকে ভেবো দোতলায় উঠে জুতোর র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোভাতুর চোখে জুতোগুলো দেখছে, তখন রাজশেখরের ঘর থেকে আইস ব্যাগ হাতে এক পা টেনে টেনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে অপুর মা যাচ্ছিল ফ্রিজের দিকে। এতক্ষণ সে কর্তাবাবুর কপালে বরফ দিচ্ছিল। ভেবোকে দেখতে পেয়ে সে বলল, "কী কচ্ছিস রে মুখপোড়া ওখানে?"

ভেবো একগাল হেসে বলল, "খুব জব্বর কষিয়েছ মাসি। রাধুদার ডানাটা খসে গেছে, একেবারে নুলো। ওকে একটা পরার শার্ট দিতে হবে।" বলেই সে সত্যশেখরের ঘরে ঢুকে ওয়ার্ডরোবটা খুলল। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো জামাপ্যান্টগুলো সরিয়ে সরিয়ে পছন্দ করছে। তখন বাইরে শুনল অপুর মা'র গলা, "পঞ্চু দ্যাখ তো ছোঁড়াটা ঘরে কী করছে?"

ভেবো চমকে গেল। সে তো সারা বাড়িই ঘুরে দেখেছে পাঁচটা লোক ছাড়া আর কেউ নেই, আর ওদের কারও নাম যতদূর সে জানে পঞ্চু নয়। তা হলে এই পঞ্চু লোকটা কোথা থেকে এল? ভেবো খুবই হুঁশিয়ার। সে চট করে খোলা পাল্লার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ছোরাটা সঙ্গে নেই বলে মনে মনে আফসোস করল।

দরজায় পঞ্চু। আড়চোখে তাকে দেখেই ভেবো "ভাগ, ভাগ" বলে চেঁচিয়ে উঠল। মুহূর্তে পঞ্চু খাটে উঠেই লাফ দিয়ে ওয়ার্ডরোবের মাথায় চড়ে ঠোঁট তুলে মাড়ি বার করে "চিঁ চিঁ কিচ কিচ কিচ" শব্দ করল। ভেবো দরজার দিকে পা বাড়াতেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসাল বাঁ কানে। কানটার প্রায় আধখানা ঝুলে পড়ল, রক্ত বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে।

ভেবো চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

"ওরে বাবা রে, মরে গেলুম, আমার কান গেল। বাঁচাও রাধুদা, বাঁচাও।"

চমকে উঠে রিভলভার হাতে রঞ্জন পড়িমরি ছুটে বেরোল ঘর থেকে। তার পেছনে পেছনে রাধু ছাড়া আর সবাই।

দোতলায় তখন অপুর মা'র কোলে পঞ্চু। ওর গালটা নিজের গালে চেপে অপুর মা বলে চলেছে, "বাবা আমার, সোনা আমার।"

রঞ্জন হতভম্ভ হয়ে গেল ভেবোকে দেখে। তারপর বলল, "কী করে এমন হল?"

"বানর কামড়ে দিল।"

রাগে কালো হয়ে উঠল রঞ্জনের চাহনি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এইসব মাথামোটা ইডিয়টদের নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়। একটার হাত গেল, অন্যটার কান।" কলাবতীর দিকে তাকিয়ে সে বলল "বানর এল কোথা থেকে?"

"আমাদের পোষা বানর।"

রঞ্জন তাকে বলল, "পারবে ওর কানে ব্যান্ডেজ করে দিতে?" কলাবতী বলল, "পারব।"

ভেবো চিৎকার করে উঠল, "না, না, না, ও ব্যান্ডেজ করবে না। দেখছ না রাধুদাকে কী করে দিয়েছে। আমায় বরং তুলো দাও, আমি কানে চেপে ধরে থাকব। আমাকে আবার সেই চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে।"

কলাবতী অস্ফুটে বলল, "চোদ্দটা নয়, এখন চারটে নিলেই হয়।"

কথাটা ভেবো শুনতে পেল এবং তেলেবেগুনে জ্বলে খিঁচিয়ে উঠল, "চোদ্দটা নয়, চারটে!" তারপর কলাবতীর চুল মুঠোয় ধরে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "এমন বানর পোষো কেন, যে মানুষের কান কামড়ে দেয়?"

সত্যশেখর এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল, এইবার আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। "খবরদার" বলে গর্জে উঠেই ভেবোর জামার কলার পেছন থেকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই থাপ্পড় কষাল। ভেবো ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। রঞ্জন রিভলভারের বাঁট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সত্যশেখরের মাথার পেছনে মারল। সে টলে পড়ে যাচ্ছিল, কলাবতী তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে ঘরের ভেতরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"শত্রুতাটা তা হলে ভালভাবেই চালাতে চান।" সত্যশেখর বলল।

"আমার দুটো লোককে আপনারা জখম করে আপসেট করে দিয়েছেন। আর একবার যদি কারুর গায়ে হাত দেন, ভেবোর ছোরা আপনাকে রেয়াত করবে না।"

রাধু বলল, "গুরু, হাতে তো ঘোড়া রয়েছে, লোকটাকে একটা দানা খাইয়ে দাও। বড্ড বাড় বেড়েছে। যদি একটা টোটাও থাকত তা হলে—" বন্দুকটা বাঁ হাতে তুলে ধরে সে বুঝিয়ে দিল, তা হলে সে কী করত।

ফার্স্ট এইড বক্স থেকে খানিকটা তুলো বার করে কলাবতী ভেবোর দিকে বাড়িয়ে ধরল। তুলো হাতে নিয়ে ভেবো একচোখ বন্ধ করে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বলছ চারটেতেই হবে?"

"কালু, একদম কোনও হেল্প করবি না।" সত্যশেখর [illegible]

করতে পারল না কলাবতীর এই দয়ার মনোভাবকে। ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "ব্যান্ডেজ তুলো কিচ্ছু দিবি না আর। এদের যা প্রাপ্য ভগবান তাই দিয়েছেন।" এই বলে সে আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে রঞ্জনের দিকে তাকাল।

রঞ্জন ঠোঁট মুচড়ে হেসে বলল, "ভগবান ভীষণ কিপ্টে, আমার প্রাপ্যটা এখনও আমায় দিলেন না। অবশ্য দেওয়ার সুযোগও আর পাবেন না।"

এই সময় ফোন বেজে উঠল। অভ্যাসবশে সত্যশেখর ফোনের দিকে হাত বাড়াতেই ওয়েবলি স্কটের নল তার হাতে খোঁচা দিল। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে রঞ্জন রিসিভার তুলল। ঘরের সবাই উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে।

"হ্যাঁ বলুন।" ভ্রূ কুঁচকে রঞ্জন শুনে গেল ওধারের কথা। তারপর বলল, "দু'ঘণ্টা নয়, তিনঘণ্টা পরই ওদের ছেড়ে দোব। সবথেকে জরুরি কথাটা নিশ্চয় মনে আছে, আমাদের ফলো করবেন না, বা মাঝপথে আটকাবার চেষ্টা করবেন না। তা হলে কয়েকটা ডেডবডি পাবেন শুধু। আমরা কিন্তু ওয়েল আর্মড, তিনটে রিভলভার আর বোমা সঙ্গে আছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমার বেরোব, উৎসাহের বশে আপনার লোকেরা যাতে কিছু করে না বসে সেজন্য ওদের যা-যা জানবার জানিয়ে দিন।"

রঞ্জন আবার কিছুক্ষণ শুনে বলল, "না, না, এদের গাড়ি নিয়েই যাব। আমরা নেমে গেলে, সত্যবাবু গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবেন নিরাপদে, অবশ্য পুলিশ কথার খেলাপ যদি না করে।.....দেখা যাক।" রিসিভার রেখে সে রাধুকে বলল, "একটা জামা পরে নাও, ব্যান্ডেজ যেন পুলিশের চোখে না পড়ে।"

রাধু দাঁত বার করে হেসে বলল, "গুরু দিলে ভাল, তিনটে রিভলভার! বোমা! আরে বোমার থলিটা তো গাড়িতেই রয়ে গেছে, তাড়াহুড়োয় আর— ভেবো, কোন ঘরটায় জামা আছে রে?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের প্রথম ঘর। দেখবে কাঠের আলমারিতে সারি সারি জামা ঝুলছে।"

রাধু উঠে দাঁড়াতেই ভেবো মনে করিয়ে দিল, "বন্দুকটা সঙ্গে নাও। বানরটাকে দেখলেই মোক্ষম এক ঘা কষিয়ে মাথা ভেঙে দিও।"

রঞ্জন ঘড়ি দেখে বলল, "তিন মিনিটের মধ্যে নেমে আসবে। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে।"

সত্যশেখর বলল, "আমরা কোথায় যাব?"

"গাড়িতে আগে উঠুন তারপর যেদিকে চালাতে বলব চালাবেন, তেল কত আছে?" রঞ্জন গম্ভীর গলায় বলল।

"কাল রাতে বারো লিটার ভরেছি।"

মনে মনে হিসেব করে রঞ্জন বলল, "হুমম্, হয়ে যাবে।"

এর পর সে মোবাইল ফোনটা বার করে নম্বরের বোতাম টিপতে টিপতে ঘরের বাইরে গেল কারও সঙ্গে কথা বলতে। ঘরের এককোণে মুরারি তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে একটি কথাও না বলে। এইবার সে মুখ খুলল, "ছোটবাবু, তোমাকে আর কালুদিকে কি মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাবে?"

হালকা সুরে সত্যশেখর বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

শুনেই ডুকরে উঠে মুরারি দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল।

"ওরে অপুর মা রে, সব্বোনাশ হয়ে গেছে রে।" চিৎকার করতে করতে সে দোতলায় উঠল। রাজশেখরের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়ে, "উহহ" বলে কাতরে উঠে অপুর মা এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গেল। " হয়েছে কী মুরারিদা?"

"আর হয়েছে! কালুদি আর ছোটবাবুকে খুন করার জন্য গাড়িতে করে ওরা এবার নিয়ে যাবে।" মুরারির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। "আমি গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ব, চালাক আমার বুকের ওপর দিয়ে। আমার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই।" বলতে বলতে মুরারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সত্যশেখরের ঘরে তখন রাধু বিস্ফারিত চোখে জামাগুলো দেখছে। একটা সিল্কের হাওয়াই শার্ট বেছে গায়ে পরার জন্য বন্দুকটা খাটের ওপর রেখে বাঁ হাতে জামার হাতা গলাল, তারপর আর গায়ে ওঠাতে পারল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। নীচের থেকে ভেবোর চিৎকার শুনতে পেল, "রাধুদা, হল তোমার? এখুনি বেরোতে হবে।"

"যাচ্ছি রে।" বলে রাধু আরও দুটো শার্ট বার করে বাঁ কাঁধে ফেলে বাঁ হাতে বন্দুকটা নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। ডাইনে তাকিয়ে দেখতে পেল সিঁড়ির মাথায় বসে একটা বানর, তাকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ব্যাগাটেলির টেব্‌লটায় হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দশাসই চেহারার সেই মেয়েটা।

অপুর মাকে দেখেই রাধুর চোখ দপদপ করে উঠল। বন্দুকের মুঠো শক্ত হল। পায়ে পায়ে সে এগোল। অপুর মা'র কাছে এসে এক হাতে বন্দুকটা খাঁড়ার কোপ দেওয়ার মতো করে তুলল। চোখ বন্ধ করে অপুর মা কুঁদোটা মাথার ওপর পড়ার অপেক্ষায় রইল। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলে দেখল ডাকাতটা তার ফলার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে। বাবার দেওয়া, দু'ভরির সোনার হারটা সে আজ পর্যন্ত কখনও গলা থেকে খোলেনি। রাধু হারটাকেই দেখছে। অপুর মা গলায় হাত দিয়ে পিছিয়ে যেতে গিয়ে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেল মেঝেয়।। রাধুর চোখ পড়ল তার ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ে।

বীভৎস হাসিতে ভরে গেল রাধুর মুখ।

অপুর মা অন্য রূপে

"এইবার অমি বদলা নোব। আমার কাঁধ নিয়েছিস, এবার আমি তোর পা নোব।" বলেই রাধু বন্দুকটা বাঁ হাতে তুলে অপুর মা'র ডান পায়ের পাতার ওপর জোরে আঘাত করল। কাটা ছাগলের মতো অপুর মা ছটফটিয়ে আছড়ে পড়ল, একটা চাপা "আহ্‌হ" ছাড়া মুখ দিয়ে আর কোনও শব্দ বেরোল না। রাধু বন্দুকটা মেঝেয় রেখে নিচু হয়ে বাঁ হাতের মুঠোয় হারটা ধরে সবেমাত্র টান দিয়েছে তখনই সাপের ছোবলের মতো অপুর মা'র দুটো হাত রাধুর চুল মুঠোয় ধরে মাথাটা টেনে নামিয়ে এনে কপাল দিয়ে রাধুর নাকে হাতুড়ির মতো আঘাত করল; মুহূর্তে রাধুকে চিত করে পেড়ে ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু রেখে উন্মাদের মতো মাথাটা সে মেঝেয় ঠুকতে ঠুকতে বলে যেতে লাগল, "ছোটবাবুকে মারবি? কালুদিকে মারবি? ছোটবাবুকে মারবি? কালুদিকে মারবি?"

সেই সময় ভেবো "রাধুদা, রাধুদা, আর এক মিনিটও দেরি করলে কিন্তু—" বলতে বলতে দোতলায় উঠে এল এবং নেতিয়ে পড়ে থাকা রাধুকে দেখে থমকে গিয়ে "মেরে ফেলেছে, রাধুদাকে মেরে ফেলেছে" বলে চিৎকার করে নেমে গেল।

"মেরে ফেলেছে" শব্দ দুটো অপুর মা'র অন্ধকার হয়ে যাওয়া চেতনায় বিদ্যুতের চমক দিল। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "মরবে না, মরবে না।" উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সে পড়ে গেল। এবার ব্যাগাটেলি বোর্ডের টেব্‌লের পায়া ধরে নিজেকে টেনে তুলছে।

"চিঁ চিঁ চিঁ"।"

অপুর মা মুখ তুলে দেখল পঞ্চু সিঁড়িতে। তার মনে পড়ল কলাবতী দুটো আঙুল তুলে ফাঁক করে দেখালেই পঞ্চু গুলতিটা এনে দিত। অপুর মা দুই আঙুল তুলে 'ভি' দেখাল, "নিয়ে আয় বাবা।"

পঞ্চু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে কলাবতীর ঘরে ঢুকল আর গুলতিটা নিয়ে বেরিয়ে এসে অপুর মা'র হাতে দিল। এবার ব্যাগাটেলি বোর্ড থেকে একটা লোহার গুলি তুলে নিল অপুর মা।

পা ফেলে হাঁটার ক্ষমতা নেই। সে হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার ছাদের দিকে নিজেকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে, মনে মনে নিজেকে বলে যাচ্ছে, "কোরু, আর একটু সহ্য কর, আর একটু, আর একটু।"

ঢালাই লোহার নকশাদার রেলিং ঘেরা ছাদ। অপুর মা রেলিং আঁকড়ে উঠে দাঁড়াল। ছাদের নীচেই ছোটবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গেটের বাইরে যেমন হেলমেট পরা বন্দুক হাতে পুলিশের, তেমনই কৌতূহলী লোকের ভিড়। সবার নজর গাড়িটার দিকে। কেউ লক্ষ করল না রেলিং ধরে দাঁড়ানো, থানকাপড় পরা ঘোমটাখসা আলুথালু

চুল মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটিকে।

মুরারি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। সে গাড়িতে এগোতে দেবে না। বুড়ো লোকটিকে হাত ধরে টেনে রঞ্জন সরিয়ে দিল। মুরারি আবার গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"তুমি যদি যেতে না দাও তা হলে এখানেই ওদের গুলি করে মারব। তিন পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যে যদি পথ ছাড়ো তো ভাল, নইলে—।" রঞ্জন রিভলভার হাতে গাড়ির পেছনের জানলার কাছে দাঁড়াল। পেছনের সিটে বসে আছে কলাবতী।

"এক— দুই—।" তিন বলার আগেই চোখ মুছতে মুছতে মুরারি সরে গেল।

ড্রাইভারের দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে সত্যশেখর, গাড়িতে এবার সে উঠবে। ভেবো আগেই উঠে বসেছে সামনের সিটে, হাতে ছোরা নিয়ে। সত্যশেখরকে সোজা করে রাখার দায়িত্বটা তার। পেছনের দরজা খুলে মাথা নামিয়ে রঞ্জন উঠতে যাচ্ছে, হাতে রিভলভার।

অপুর মা লোহার গুলিটা ছিলেয় লাগিয়ে গুলতি তুলে ধরল। শরীরে এখন সে যন্ত্রণা বোধ করছে না। হাত কাঁপছে না। তার কাছে একটাই গুলি। রবারের ছিলে নাক পর্যন্ত এক হাত টেনে এনে একচোখ বন্ধ করল।

সত্যশেখরই প্রথম রিভলভারটা হাত থেকে পড়ে যেতে দেখল, তারপর দেখল রঞ্জনের কোমর থেকে উর্ধ্বাংশ গাড়ির মধ্যে, নীচের দিক গাড়ির বাইরে পড়ে রয়েছে। একটুও শব্দ না করে ব্যাপারটা ঘটে গেল। জীবনে এই প্রথম সত্যশেখর একটা কাজ করল যাতে জানা গেল তার উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্টই ভাল। সে চট করে রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভেবোর দিকে তাক করে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "নেমে আয় শুয়োর।"

গেটের বাইরে থেকে পুলিশ লক্ষ করে যাচ্ছিল ওদের গতিবিধি। তারা চমকে গেল সত্যশেখরের হাতে রিভলভার দেখে এবং ছুটে এল সিংহিবাড়ির মধ্যে। সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল রঞ্জনের খুলি ভেঙে রক্ত বেরোচ্ছে কেন? কলাবতী গাড়ির মধ্যেই গুলিটা কুড়িয়ে পেয়ে প্রথমেই তাকাল দোতলার ছাদের দিকে। যাকে দেখবে ভেবেছিল তাকেই দেখল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে ঢুকে পঞ্চুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠে ছাদে গিয়েই "পিসিইই" বলে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপুর মা'র বুকে।

"ছাড়ো কালুদি, ছাড়ো, রান্নাবান্না হয়নি এখনও। কারুর খাওয়া হয়নি, মুরারিদাকে বলো শকুন্তলাকে ডেকে আনতে, ক'টাদিন আমি এখন তো রান্নাঘরে যেতে পারব না।"

"যেতে হবে না, আমি রান্না করব।"

"খবদ্দার, রান্নাঘরে ঢুকবে না, রং কালো হয়ে যাবে।"

অ্যাম্বুলেন্স এসে রাধু ও রঞ্জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ওদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ভেবোকে নিয়ে গেল পুলিশ। সিংহিবাড়ি কয়েক ঘণ্টার জন্য রাহুর গ্রাসে পড়েছিল, এখন তা থেকে মুক্তি পেল। বাড়ির সবার এজাহার নেওয়ার পর অপুর মাকে পুলিশ ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেটা এইরকম :

"আপনি একাই ডাকাত দু'জনকে মারলেন?"

ঘোমটা চোখ পর্যন্ত টেনে জবাব হল, "ওম্মা, আমি একা পারব কেন, কালুদি, ছোটকত্তা, মুরারিদা, কত্তাবাবা আর পঞ্চু সবাই মিলে চেষ্টা করে তবেই না সাহস পেয়েছি।"

"পঞ্চু? সে কে?"

"আমার ছেলে।"

"কই, তাকে তো দেখছি না! ডাকুন তাকে।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তাই তো, গেল কোথায় পঞ্চু? পুলিশ কী বস্তু, থানা থেকে পালানো পঞ্চু তা জানে এবং জানে বলেই এখন সে দেবদারু গাছের মগডালে।

রাতে কলাবতী ফোন করে মলয়াকে সবিস্তারে সারাদিনের ঘটনা বলার পর শেষে যোগ করল, "বিশ্বাস করবেন না বড়দি, রিভলভারটা হাতে নিয়ে কাকার সে কী অগ্নিমূর্তি! আমি তো ভাবলুম এই বুঝি ভেবোর ইহলীলা খতম হবে।"

"তুমি ভাবতে পারো কিন্তু আমি ভাবছি না, যতদূর জানি সতু জীবনে কখনও রিভলভার হাতে ধরেনি। যদি গুলি ছুড়ত তা হলে ভেবো নয়, হয়তো তোমারই ইহলীলা সাঙ্গ হত। তবে ও যে একটা অস্ত্র হাতে ধরেছে, ওই অসমসাহসী কাজের জন্য ওকে আমি ফুলহাতা একটা সোয়েটার নিজে হাতে বুনে দেব। কথাটা তুমি ওকে বলে দেখো, শুনেই বলবে নিউ মার্কেট থেকে কিনে নিজের হাতে বোনা বলে চালাচ্ছে।" মলয়া হেসে উঠল কথার শেষে।

রাতে খাবার টেবলে কলাবতী বলল, "কাকা, তোমাকে বড়দি একটা ফুলহাতা সোয়েটার দেবে নিজের হাতে বুনে।"

ভ্রূ কুঁচকে সত্যশেখর তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই বিশ্বাস করলি? ময়দানে ভুটিয়াদের কাছ থেকে কিনে নিজের হাতে বোনা বলে চালাবে সেটা কি জানিস? ও বকদিঘির মেয়ে, এটা মনে রাখিস। আর মনে রাখিস, আটঘরার মেয়ে হল অপুর মা।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG